ভোক্তাকণ্ঠ

ক্যাব জেলা প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

জ্বালানি রূপান্তর ও বিদ্যুতের যৌক্তিক মূল্যহার এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন

কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)

• ক্যাব জেলা প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা •

জ্বালানি রূপান্তর ও বিদ্যুতের যৌক্তিক মূল্যহার এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন

প্রকাশ কাল
এপ্রিল ২০২৩

কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর অনলাইন প্লাটফর্ম
ভোক্তাকণ্ঠ কর্তৃক প্রকাশিত
বাড়ি # ৮/৬ (দ্বিতীয় তলা), সেগুনবাগিচা
ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত
+৮৮ ২-২২৩৩৮২৮৫৮

ডিজাইন
মো. মনসুর আলম

প্রডাকশন
রাইয়্যান প্রিন্টার্স
২৭৭/২এ এলিফ্যান্ট রোড, কাটাবন, ঢাকা-১২১৫
০১৯১৫৮৮৩৩৩৫

ভোক্তাকণ্ঠ ভোক্তাকণ্ঠ প্রকাশনা

ক্যাব জেলা প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি
জ্বালানি রূপান্তর ও বিদ্যুতের যৌক্তিক
মূল্যহার এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন
[Energy Transition & Rational Electricity Tariff and Renewable Energy Development]

ভূমিকা

০৮ এপ্রিল ২০২৩ শনিবার কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ক্যাবের জেলা প্রতিনিধিদের নিয়ে 'জ্বালানি রূপান্তর ও বিদ্যুতের যৌক্তিক মূল্যহার এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন' শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার বাংলামটরস্থ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ইস্ফেন্দিয়ার জাহিদ হাসান মিলনায়তনে সকাল ৯টা থেকে বেলা ১.৩০টা পর্যন্ত চলে কর্মশালা, প্রশ্নোত্তর ও মতবিনিময়। কর্মশালা উদ্বোধন করেন ক্যাবের সভাপতি জনাব গোলাম রহমান। এ কর্মশালায় তিনটি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যথাক্রমে প্রকৌশলী এইচ এম জি সরোয়ার, ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ ও ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া। ক্যাবের জেলা প্রতিনিধিরা উপস্থাপিত গবেষণা প্রবন্ধ এবং বাংলাদেশে ভোক্তা অধিকার আন্দোলন প্রসঙ্গে প্রশ্ন রাখেন, মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রবন্ধ উপস্থাপনকারীদের পাশাপাশি মুক্ত আলোচনা ও ভোক্তা অধিকার আন্দোলনের আগামী দিনের পরিকল্পনার নানা দিক তুলে ধরেন ক্যাবের জেষ্ঠ্য সহ-সভাপতি ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. এম শামসুল আলম। আলোচনা শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ভোক্তা অধিকার আন্দোলন এগিয়ে নিতে আহবান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ক্যাবের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট হুমায়ুন কবির ভূঁইয়া। প্রশিক্ষণ কর্মশালা সমন্বয় করেন কো-অর্ডিনেটর (রিসার্চ), ক্যাব এবং ভোক্তা অভিযোগ নিষ্পত্তি জাতীয় কমিটি, ক্যাব-এর সদস্য প্রকৌশলী শুভ কিবরিয়া। কর্মশালা সম্প্রচারে সহযোগী ভূমিকা পালন করে ভোক্তাকণ্ঠ ডটকম।

কর্মশালায় উপস্থাপিত প্রবন্ধ ও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ক্যাব প্রতিনিধিদের দেয়া মতামতের গুরুত্ব বিবেচনায় এই কর্মশালার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নিয়ে এই পুস্তিকা প্রকাশিত হলো।

সূচনা: প্রকৌশলী শুভ কিবরিয়া

প্রিয় ভোক্তা অধিকার আন্দোলনের কর্মীরা, আজ আপনারা রমজান মাসে অনেক কষ্ট সয়ে যেভাবে সকাল সকাল নির্ধারিত সময়ের আগেই কর্মশালার ভেন্যুতে হাজির হয়েছেন তা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দিত ও আশান্বিত। শুরুতে আমরা প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এখন ক্যাবের সভাপতি মহোদয় তার মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে কর্মশালা অনুষ্ঠানের মূল কার্যক্রম শুরু করবেন।

উদ্বোধন: জনাব গোলাম রহমান
সভাপতি, ক্যাব, কেন্দ্রীয় কমিটি

ভোক্তা আন্দোলনে সক্রিয় প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ। পবিত্র রোজা-রমজানের দিনে আপনারা দূর-দূরান্ত থেকে ক্যাব আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য এখানে এসেছেন। সেজন্য আমরা আপনাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। অনুগ্রহ করে আপনারা আমার ছালাম ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

জ্বালানি রূপান্তর (Energy Transition) ও বিদ্যুতের যৌক্তিক মূল্যহার (Rational Electricity Tariff) এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন (Renewable Energy Development) শীর্ষক আজকের এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় (1) Costs Rationalization in Power & Energy Supply and Renewable Energy Promotion (2) Energy Justice : Legal Mapping of Consumers Right to Energy and Environment (3) To protect Consumers Energy Right Ensuring Energy Justice: CAB Experience শীর্ষক এই তিনটি গবেষণধর্মী প্রবন্ধ উপস্থাপিত হবে।

পরিশেষে ওই ৩টি প্রবন্ধের আলোকে Energy Transition and Predatory Cost in Power & Energy Supply শীর্ষক একটি পর্যালোচনাও এই কর্মশালায় উপস্থাপিত হবে। তাতে চলমান প্রাথমিক জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত রূপান্তর বা সংস্কারে ভোক্তার জ্বালানি ও পরিবেশ অধিকার কতটা সংরক্ষিত হয়, তা যেমন খতিয়ে দেখা হবে, তেমনি অন্যদিকে সে অধিকার সংরক্ষণে জ্বালানি সুবিচার নিশ্চিতকরণে বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধানাবলীর ভূমিকা ও সীমাবদ্ধতাও খতিয়ে দেখা হবে। পাশাপাশি জ্বালানি সুবিচার নিশ্চিত করার ব্যাপারে ক্যাবের অভিজ্ঞতাও আপনাদের জানানো হবে। এ-ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা মোটেও সুখকর নয়।

চলমান জ্বালানি রূপান্তরে প্রাথমিক জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহে অন্যায় ও অযৌক্তিক ব্যয়বৃদ্ধিতে একদিকে মূল্যহার ও ভর্তুকি যেমন বেড়েছে, তেমনি ভর্তুকি কমাতে অন্যায় ও অযৌক্তিক সরবরাহ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ না করে পুনরায় মূল্যহার বৃদ্ধি করা হয়েছে। এবং তারই প্রভাবে জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি ভোক্তাদের জন্য এখন রীতিমত অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছে। প্রাথমিক জ্বালানি ও বিদ্যুৎ বাজার এখন প্রতিযোগিতাবিহীন, এবং ওলিগোপলির শিকার। ফলে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন স্বার্থসংঘাত তথা অসমতার শিকার। এই অবস্থায় জ্বালানি ও খাদ্য নিরাপত্তা উভয়ই বজায় রাখা এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করা বাংলাদেশের

জন্য অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় চলমান জ্বালানি রূপান্তর মূল্যায়নক্রমে ক্যাব 'বাংলাদেশ জ্বালানী রূপান্তর নীতি-২০২২' প্রস্তাব করেছে।

জ্বালানি অধিকার ও জ্বালানি সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য ক্যাব প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ জ্বালানি রূপান্তর নীতি-২০২২' বাস্তবায়িত হতে হবে। সেজন্য ভোক্তা আন্দোলনের বিকল্প নেই। এ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আজকের এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ রইল, আজ এখন, এখান থেকে আপনারা আন্দোলন শুরু করুন এবং সে আন্দোলন গ্রাম-গঞ্জে ছড়িয়ে দিন। ভোক্তাদের একতাবদ্ধ করুন। তাহলেই অন্দোলন সফল হবে এবং জ্বালানি ও পরিবেশ সুরক্ষার অধিকার ও জ্বালানি সুবিচার নিশ্চিত হবে ইনশাল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

পরিশেষে আমি এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

প্রবন্ধ উপস্থাপন
প্রকৌশলী এইচ এম জি সরোয়ার

প্রবন্ধের শিরোনাম : Costs Rationalization in Power & Energy Supply and Renewable Energy Promotion.

আলোচনার শুরুতে আমরা বাংলাদেশের জ্বালানিখাত নিয়ে একটা ওভারভিউ দেখবো। বাংলাদেশের জ্বালানিখাত বলতে আমরা বুঝি বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং পেট্রোলিয়াম।

প্রথমে বিদ্যুৎ খাত দিয়েই শুরু করি, আমার কাছে যে তথ্যগুলো রয়েছে এগুলো সব সরকারি তথ্য। বাংলাদেশে বর্তমানে ১৫৩টির মতো বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে। তার মধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক অর্থাৎ গ্যাসভিত্তিক কেন্দ্র আছে ৬২টি, তরল জ্বালানিভিত্তিক ৭৪টি, কয়লাভিত্তিক বিদুৎ কেন্দ্র ৬টি, পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ১টি, আর সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র ছোট পর্যায়ে ১০টি আছে।

স্থাপিত ক্ষমতা ২৬,৭০০ মেগাওয়াট। যদিও গ্রিডে সংযুক্ত ক্ষমতা ২২,৭০০ মেগাওয়াট। এর মধ্যে সর্বোচ্চ উৎপাদন দেখেছি আমরা, ২০২২ সালের ১৬ই এপ্রিল- সেটি ১৪,৭৮২ মেগাওয়াট। অর্থাৎ স্থাপিত ক্ষমতা ও সর্বোচ্চ উৎপাদনের মাঝে আমরা একটা বড় ব্যবধান দেখতে পাচ্ছি। বিদ্যুতের অ্যাকসেস শতভাগ– এটা সরকারি তথ্যমতে। এবং বিদ্যুতের গ্রাহকসংখ্যা সাড়ে ৪ কোটি। মাথাপিছু গড় উৎপাদন প্রায় ৬০৮.৭৮ কিলোওয়াট/ঘণ্টা।

স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর মধ্যে সরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে, একই সাথে বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রও আছে। আমাদের সরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্থাপিত ক্ষমতা প্রায় ১১,৫৮৫ মেগাওয়াট। এখানে সরকারি বিভিন্ন উৎপাদন কোম্পানিগুলো আছে যেমন বিদুৎ উন্নয়ন বোর্ড, আশুগঞ্জ, ইজিসিবি, নর্থওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন। মোটামুটি এগুলো সরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

পাবলিক সেক্টরে আমাদের ১১,৫৮৫ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। সরকারের সাথে বিভিন্ন জয়েন্টভেঞ্চার আছে। সেখানে পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড। একই সাথে রামপালে বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী বিদ্যুৎ কেন্দ্র। আর বিআর পাওয়ার। এগুলো যৌথ উদ্যোগে বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এই মুহূর্তে সেখানে স্থাপিত ক্ষমতা আছে প্রায় ১৪০০ মেগাওয়াট। হয়তো পায়রা বিদ্যুৎ উৎপাদন আসলে এটার উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণ হবে। বেসরকারি খাতে স্থাপিত ক্ষমতা আছে প্রায় ৯ হাজার মেগাওয়াটের মতো। এবং আমরা বিদ্যুৎ আমদানি করে থাকি– প্রায় ১হাজার ১৬০ মেগাওয়াট।

পাবলিক সেক্টরে বা সরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ক্ষমতা আছে ৫০ শতাংশ। বেসরকারি খাতে আছে ৩৯ শতাংশ। যদি আমরা বিদ্যুৎ আমদানি বেসরকারি খাত ধরি, বেসরকারি খাত ৪৪ শতাংশ আর জয়েন্টভেঞ্চার আছে ৬ শতাংশ। জ্বালানিভিত্তিক স্থাপিত ক্ষমতার ক্ষেত্রে দেখা যায়, গ্যাসভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৪৩ শতাংশ এবং তরল জ্বালানিভিত্তিক ফার্নেস অয়েল আর ডিজেলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা আছে প্রায় ৩৮ শতাংশ। বিদ্যুৎ আমদানি ৫ শতাংশ, হাইড্রো ১ শতাংশ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ১ শতাংশ।

গ্যাস বিদ্যুৎকেন্দ্র এই যে ৪৩ শতাংশ, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে এ তথ্য নেওয়া হয়েছে। প্রায় ৭১ শতাংশ বিদ্যুৎ যেটা উৎপাদিত হয়েছে তা গ্যাস থেকে এসেছে। যদিও গ্যাসের ক্যাপাসিটি মোট বিদ্যুতের ৪৩ শতাংশ। কিন্তু উৎপাদিত বিদ্যুতের ৭১ শতাংশ আসছে গ্যাস থেকে।

এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা যেভাবে বেড়েছে তার একটা তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হলো। ২০১০ সালে ১০৩০ মেগাওয়াট, ২০১১ সালে ১৭৬৩ মেগাওয়াট। এভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে। বিগত ১০ বছরে আমাদের প্রায় ১২ শতাংশ বিদুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে কিন্তু মূলত বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে ৭ শতাংশ। এখানে ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২১ এ চারটা আমি হাইলাইট করেছি। এখানে ডান পাশের গ্রাফে দেখি। যে বছরওয়ারি ক্যাপাসিটি ২০১৮ থেকে ২০১৯ এখানে হঠাৎ করে একটা বড় উল্লম্ফন দেখা যাচ্ছে। কারন এ সময়ে অনেক বেশি বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদনে আসছে এবং এটার তাৎপর্য রয়েছে। এটা আমরা আলোচনার পরবর্তী সময়ে দেখবো। বেসরকারি খাতে ২০১৮ সালে প্রায় ৪০০০ মেগাওয়াট, ২০১৯ সালে ২৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এদের অধিকাংশই তরল জ্বালানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র যা অল্প সময়ে উৎপাদনে এসেছে। এ কারণে একটা স্পাইক দেখা যাচ্ছে।

এখন আমরা একটু গ্যাস সেক্টরের অবস্থা দেখি, গ্যাস সেক্টরে আমাদের প্রায় ২৬টা গ্যাস ফিল্ডস আছে। এখানে ২০টা উৎপাদনে আছে। গ্যাসের উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২৭৫০ এমএমসিএফডি। আমাদের টোটাল রিকোভারেবল রিজার্ভ ৪০.০৯ টিসিএফ।

বর্তমানে ৯টির মতো রির্জাভ আমাদের অবশিষ্ট আছে। প্রতিদিন আমাদের ঘাটতি আছে ৫৩০ এমএমসিএফডি। শেভরন আর টাল্লো অর্থাৎ বেসরকারি খাত থেকে প্রায় ১৫০০

এমএমসিএফডির মতো গ্যাস উৎপাদন করা হয়। দেশীয় কোম্পানিগুলো প্রায় ৮০০ অর্থাৎ এখানে বেশিরভাগ গ্যাস বেসরকারি কোম্পানি তথা আইওসি দ্বারা উৎপাদন করা হয়। এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে দেখা গেছে সর্বোচ্চ ২৩০৬ এমএমসিএফডি গ্যাস উৎপাদন করেছে টাল্লো।

গ্যাসের একটা বড় অংশ আমাদের আমদানি করতে হয়। ১০ বছরের যে লং টার্ম এগ্রিমেন্ট আছে, সেলস এগ্রিমেন্ট, পেট্রোবাংলা এবং কাতার গ্যাসের সাথে প্রায় আড়াই মিলিয়ন মেট্রিক টন আর ওমান গ্যাসের সাথে দেড় মিলিয়ন অর্থাৎ চার মিলিয়ন মেট্রিকটন এলএনজি আমদানি করি । একই সাথে স্পট মার্কেট থেকে আমরা কিছুটা এলএনজি আমদানি করে থাকি। মোট ৩৬৬২ মিলিয়ন ঘনমিটার বার্ষিক চাহিদার বিপরীতে ২০২১-২২ সালে দেখা গেছে প্রায় ৩১,২২১ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস আমাদের উৎপাদন হয়েছে। যার মধ্যে আমদানি প্রায় ৮০০০ মিলিয়ন ঘনমিটারের মতো।

এখন আমরা পেট্রোলিয়াম সেক্টরের অবস্থা দেখি। আমাদের বার্ষিক পেট্রোলিয়ামের চাহিদা আছে ৭৩ লাখ মেট্রিক টন। যদিও ২০২১-২২ সালে দেখা গেছে প্রায় ৬৯ লাখ মেট্রিক টন ব্যবহৃত হয়েছে দেশজুড়ে। এর মধ্যে ৮ শতাংশ স্থানীয় উৎস থেকে এসেছে। ৯২ শতাংশ গ্যাস বা পেট্রেলিয়াম তরল জ্বালানি আমদানি করা হয়েছে।

মোট তরল জ্বালানি ব্যবহারের ৬২ শতাংশ পরিবহন খাতে ব্যবহৃত হয়। ১৭ শতাংশ ব্যবহৃত হয় কৃষিতে এবং ১৩ শতাংশ পেট্রোলিয়াম বিদ্যুৎখাতে ব্যবহৃত হয়। আবাসিক খাতে মাত্র ১.৫ শতাংশ অন্যান্য খাতে ব্যবহৃত হয় ২ শতাংশ। আমরা ২০২০ থেকে ২০২২ সালে যে পরিমাণ পেট্রোলিয়াম আমদানি করেছিলাম তার একটা তুলনামূলক বিবরণী দেখতে পাচ্ছি। ২০২০-২১ সালে ৫৭,২৮,৩৬০.২৫ মেট্রিক টন আমদানি করে সরকারের খরচ হয়েছিলো ২২,১২৬ কোটি টাকা। ২০২১-২২ সালে এসে তার চেয়ে কম ৫১,৪১,৭২৪.৩৩ মেট্রিক টন পেট্রোলিয়াম আমদানি করে সরকারের খরচ হয়েছিলো প্রায় ৪৮,৪৩৫ কোটি টাকা।

কয়লার ক্ষেত্রে দেখেছি, রির্জাভ আছে মোট ৩২২ মিলিয়ন টন। প্রায় ১ মিলিয়ন টনের মতো হলো দেশীয় উৎপাদন এবং আমদানি হয় ২ মিলিয়ন টনের মতো। ৩ মিলিয়ন টন আমরা প্রতিবছর ব্যবহার করে থাকি। একই সাথে একটা বিষয় উল্লেখ্য যে, আমদানিকৃত কয়লার একটি বড় অংশ বিদ্যুতে ব্যবহৃত হয় এবং আমাদের বাংলাদেশের দুইটি বড় বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র যেটা চায়না বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ এবং বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ কোম্পানি রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এ দুইটি বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র আমদানিকৃত কয়লার উপর নির্ভরশীল।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি , গ্যাস এবং পেট্রোলিয়াম খাতের চিত্র দেখার পরে আমরা একটু দেখি, আমাদের অবস্থা আরামদায়ক। এখানে কোনো চ্যালেঞ্জ আছে কিনা। আমরা দেখতে পাচ্ছি, গত ১০ বছরে প্রায় ১২ বার ভোক্তা পর্যায়ে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে এবং ২০২৩ সালে অন্তত ১ মাসের মধ্যে দুই বার ৫ শতাংশ করে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধির ধারা চলমান এবং ২০১০ সাল থেকে এখন অবধি ২৬০ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। আমরা গত বছরে

দেখেছি, বাংলাদেশে জ্বালানি সংকট ছিলো, তখন আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিলো। তখন আমাদের তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো বন্ধ রেখে গত বছর শিডিউল লোডশেডিং হয়েছে। সুতরাং একইসাথে ট্যারিফ বৃদ্ধি পাচ্ছে আর একই সাথে আমরা দেখেছি জ্বালানি সংকটের কারণে লোডশেডিং হচ্ছে। আমাদের তরল জ্বালানিতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র থাকার কারণে আমাদের বিদ্যুৎখাতটা বর্তমানে গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন ডিজরাপশনের কারণে ভালনারেবল হয়ে গেছে।

একইসাথে আমরা দেখতে পারছি, বিদ্যুতের খরচ ক্রমাগত যেহেতু বাড়ছে, সে কারণে যে বিশাল রাজস্ব ঘাটতি তৈরি হচ্ছে এবং বড় ধরনের সাবসিডি বাজেটারি ট্রান্সফর্ম হচ্ছে এ বিদ্যুৎখাতে। সরাসরি এ সাবসিডি ভোক্তার অর্থ থেকেই পরিশোধিত হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি সাবসিডি সমন্বয় ও বাজেটে ট্রান্সফার এর সাথে সমন্বয় কমিয়ে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। একইসাথে মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে আবার বিপুল অংকের সাবসিডিও যাচ্ছে। এই হলো সামগ্রিক অস্বস্তির জায়গা, মূল্যবৃদ্ধি ও বড় ধরনের রাজস্ব ঘাটতি।

এই যে ট্যারিফ বৃদ্ধি হচ্ছে, এটা যৌক্তিক কিনা? সরকারের বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণের কৌশলটা আমরা দেখি। সরকারের একটা পাওয়ার প্রাইসিং ফ্রেমওয়ার্ক আছে, যেটা ২০০৪ সালে অনুমোদন করা হয়ছে। এখানে পাওয়ার প্রাইসিং ফ্রেমওয়ার্ক এর মূল কথা হচ্ছে মূল্য নির্ধারণ হবে কস্ট রিফলেক্টিং। এটা সরকারের নীতিমালা। কস্ট রিফলেক্টিং এর মধ্যে সরকারের উৎপাদন খরচ, সরকারের বিতরণ খরচ, সরকারের সঞ্চালন খরচ, একইসাথে সার্ভিস বা সেবা মূল্য, কিছু উদ্ধৃত্ত- এই সব কিছুই মূল্যহার প্রণয়নে প্রতিফলিত হতে হবে।

যদিও একই সাথে দরিদ্র ও আন্ডারপ্রিভিলেজ যেসব লোকজন আছে তাদের জন্য হয়তো বিশেষ মূল্যহার থাকবে। যেটাকে ভর্তুকিপ্রাপ্ত মূল্যহার বলে এবং মূল্য নিয়মিত সমন্বয় হতে হবে। ট্যারিফের মূলত দুইটা অংশ। বেসরকারি বিদ্যুতের ক্ষেত্রে এটা হয়ে থাকে। একটা হলো ক্যাপাসিটি পেমেন্ট, আরেকটা জ্বালানি পেমেন্ট। মোটামোটি এটা হলো প্রাইসিং ফ্রেমওয়ার্ক। এটা ২০০৪ সালে অনুমোদিত।

এরপর দেখি ট্যারিফের মেথডোলোজি। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন একটা স্বাধীন সংস্থা। তারা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। এই মূল্য নির্ধারণের যে মেথডোলোজি আছে তা হলো, নির্ধারিত মূল্যের যে অংশটা ভোক্তা পর্যায়ে যাবে সেটার দুটি অংশ। দুইটা খরচ, একটা হচ্ছে সার্ভিস খরচ আরেকটা হচ্ছে জ্বালানি খরচ। সার্ভিস খরচের একটা অংশ ইউটিলিটিগুলোর রাজস্ব চাহিদা এবং এর বড় অংশ হলো বিদ্যুৎ ক্রয়ের ব্যয়। এই ব্যয়টাই হলো আমাদের চিন্তার বিষয়। এ ব্যয় বৃদ্ধির কারণেই ক্রমাগত আমরা মূল্যবৃদ্ধি দেখতে পাচ্ছি।

২০০৭-০৮ সালে দেশে মাত্র ২৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ছিলো। তার মধ্যে ১৯টি ছিলো সরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র আর ৮টি ছিলো বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র। তখন সরকারি খাতে উৎপাদন ছিলো ৬২ শতাংশ আর বেসরকারি উৎপাদন ছিলো প্রায় ৩৪ শতাংশ। সে সময়ে ২৪৩১৪ মিলিয়ন ইউনিট উৎপাদন হচ্ছিলো, সে অবস্থায় আমরা দেখেছি, রাজস্ব ঘাটতি ছিলো ৬৫৭ কোটি টাকা। আজকে ২০২১-২২ সালে এসে আমরা দেখছি বাংলাদেশে মোট

১৫৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে। যার মধ্যে মোট প্রায় অর্ধেক ৮৬টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বেসরকারি খাতে আছে। সরকারি খাতের উৎপাদন হলো প্রায় ৩৭ শতাংশ, জয়েন্টভেঞ্চারের ৪.৬ শতাংশ। কিন্তু আইপিপি, ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বিদ্যুৎ আমদানি- এখানেই প্রায় ৫৮ শতাংশ বিদ্যুৎ। ২০০৭-০৮ সালে যেখানে ২৪,০০০ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতো, সেক্ষেত্রে আমরা দেখছি বর্তমানে ৮৫,০০০ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। এখন আমরা দেখছি রাজস্ব ঘাটতি প্রায় ২৭,০০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ বেসরকারি বিদ্যুতের পরিমাণ বেড়েছে এবং একইসাথে রাজস্ব ঘাটতিও বেড়েছে।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড পাইকারি বিদ্যুৎ ক্রয় করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে এবং ইউটিলিটিগুলোর কাছে পাইকারি হারে তা বিক্রয় করে। এখানে দেখা যায় যে, পিডিবির নিজস্ব উৎপাদন থেকে আমরা পাচ্ছি ২০ শতাংশ বিদ্যুৎ। মোট সরকারি উৎপাদন ৪০ শতাংশ। প্রায় ৫৫ শতাংশ বিদ্যুৎ আইপিপি থেকে ক্রয় করা হচ্ছে কিন্তু এটার জন্য ৬৭ শতাংশ অর্থ ব্যয় হচ্ছে। আইপিপির বিদ্যুৎ অর্থাৎ বেসরকারি বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ আমদানি এই তিন খাতে সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় হচ্ছে। যদিও এখানে দেখা যাচ্ছে, পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এভারেজ খরচ ইউনিট প্রতি ১৩ টাকা ৮৩ পয়সা এবং এর উৎপাদনও কম না ৫ শতাংশ দেখা যাচ্ছে। তবে পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অপারেশন পিরিয়ড অল্প। এর সাথে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, আদানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলা আমাদানিভিত্তিক হওয়ায় এখানেও ব্যাপক অর্থ ব্যয় হবে। আপাতত দেখা যাচ্ছে যে ভাড়া ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিদ্যুৎ আমদানি এ তিন জায়গাতেই ৬৭ শতাংশ অর্থ ব্যয় হয়েছে বিদ্যুৎ কিনতে গিয়ে।

বিদ্যুতের বিতরণ ব্যয় বিষয়ে আমাদের প্রথম উপরে যে গ্রাফটা আছে ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুতের পার ইউনিটের সাপ্লাই কস্টটা প্রথম দিকে খুবই বেশি ছিলো। পরবর্তীতে সেটা স্ট্যাবল হয়ে এখন মোটামুটি স্ট্যাবল আছে। তার পরে হচ্ছে আইপিপির গ্রাফ, সেটা আসলে ক্রমাগত বাড়ছে। মানে আইপিপি থেকে বিদ্যুৎ কিনতে সরকারকে বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয় এবং তৃতীয়টা বিদ্যুৎ আমদানি। অর্থাৎ আমদানি খরচ, এটাও বেশি। এই তিনটা খরচই সরকারের যে বাল্ক সেলিং ট্যারিফ আছে, তার থেকে অনেক বেশি। এবং এ তিনটা আইপিপি, আরপিপি আর আমদানি এই তিনটা কারণেই আমরা দেখছি যে, অপারেটিং ব্যয় যেটা সাত হাজার পাঁচশো কোটি টাকা, সেটা এখন একাত্তর হাজার কোটি টাকাতে এসে ঠেকেছে। আর এখান থেকে রাজস্ব পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ৪৪ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ বাড়ছে, তার সাথে রাজস্ব আয়ের বিশাল ঘাটতি তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ বেসরকারি বিদ্যুৎ ও আমদানিকৃত বিদ্যুতের ব্যবহার যত বাড়ছে, তার সাথে বিদ্যুতের খরচও ক্রমাগত বাড়ছে।

প্রায় ৮০ শতাংশ তরল জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে বেসরকারিভাবে। এগুলো তৈরি করা হয় অল্প সময়ের অপারেশনের জন্য। আমাদের ১৫৩টা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, এর মধ্যে ৮৬টি বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং তরল জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো ছোট ছোট স্কেলে। কিছু পিক লোডেড, অর্থাৎ পিক আওয়ারে চলে। দীর্ঘসময় ধরে চললে তাকে বলে

বেসলোডেড অপারেশন। তরল জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো বেসলোডেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র হওয়ার মানেই হলো অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ফার্নেস অয়েল আর ডিজেলে চলা এসব দীর্ঘসময়ব্যাপী উৎপাদনে থাকা বিদ্যুৎ কেন্দ্রই বিদ্যুতের খরচ বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করছে। মোট ৮৬টি বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৫০টি তরল জ্বালানির। তরল জ্বালানির বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন একটা সময় আমরা অনেক বেশি দেখেছি। পরবর্তীতে এটার উৎপাদন অনেক ব্যয়বহুল হয়। এটার উৎপাদন সীমিত দেখালেও এখানে ক্যাপাসিটির বিষয় আছে, তারপর আছে কম ব্যবহারজনিত খরচ। এটার অনেকগুলো স্টাডি আছে, পত্রিকায় আসে। কখনো ৪০ শতাংশ, কোথাও স্টাডিতে আছে ৫০ শতাংশ। যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ভোক্তার জন্য তৈরি করা হয় সেটা যদি ভোক্তাকেই সার্ভিস না দেয় সেটার ভিত্তিতে চার্জ আরোপ করা একেবারেই অযৌক্তিক। এখানে ট্যারিফ অযৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯ সালে যখন বিদ্যুৎ সংকটের জন্য ভাড়াভিত্তিক তরল জ্বালানির বিদ্যুৎ কেন্দ্র আসলো, সেগুলো ৩ থেকে ৫ বছরের জন্য এসেছিল, এগুলো ছিলো অত্যন্ত ব্যয়বহুল বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এগুলো ২০১৭ সালের মধ্যে অবসরে চলে যাওয়ার কথা ছিলো, কিন্তু এগুলো আবার চালু হয়েছে। এখানে আলোচ্য বিষয় হলো, ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্যাপাসিটি পেমেন্ট আর জ্বালানি পেমেন্ট। দুইটা পেমেন্ট থাকে। ক্যাপাসিটি পেমেন্টের ভিতরে তাদের যে ইনভেস্টমেন্ট থাকে সেটা তারা ক্যাপাসিটি পেমেন্ট দিয়ে তুলে নিয়ে যায়। সুতরাং তাদের লাভ আর ইনভেসমেন্ট তারা ক্যাপাসিটি পেমেন্টের মাধ্যমে তুলে নিয়ে গেছে। কিন্তু তারপরও তারা এক্সটেনশন নিয়েছে, অপারেশন করেছে। এখানে একটা খরচ বা ব্যয়বৃদ্ধির সুযোগ থাকে এবং সেটা ঘটেছে।

একইসাথে ২০১০ সালে অনেকগুলো বেসলোডেড সরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছিলো। এ সরকারি প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি এগুলোর প্রত্যেকটাই সময় ও ব্যয়ের সীমা অতিক্রম করেছে। নির্ধারিত সময়ে এইসব বিদ্যুৎ কেন্দ্র অপারেশনে না আসার কারণে তরল জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল হতে হয়েছে এবং তা ক্রমাগত ব্যয় বৃদ্ধি করেছে।

বাংলাদেশে বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয়েছিলো ৯০ দশকে। ৯০ দশকে পুরো পৃথিবীতে উন্নয়শীল দেশগুলোতে আসলে বেসরকারি বিদ্যুতের একটা ঝড় চলছিলো মনে হয়। তখন ডোনার এজেন্সিগুলো- ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এডিবি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ফোর্সফুল ট্রান্সফার পলিসি শুরু করছিলো। সেক্টর রিফর্মে তাদের এজেন্ডা ছিলো কর্পোরেটাইজেশন, স্বাধীন রেগুলেটরি বডি ক্রিয়েট করা, প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা। বেসরকারি খাতকে অন্তর্ভুক্ত করা এটা ছিলো তাদের বড় ধরনের পলিসি ট্রান্সফার।

বাংলাদেশ ১৯৯৬ সালে প্রাইভেট জেনারেশন পলিসি প্রণয়ন করে। তার মাধ্যমে বাংলাদেশে বেসরকারি বিদ্যুতের যাত্রা শুরু করে। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত মোট ৮টা বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্র ছিলো। পরবর্তীতে দেখা গেল ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের ভিতরে প্রায় ৭৮টা বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র এসেছে। যে নীতিকাঠামোর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো চুক্তিবদ্ধ হয় সেটা পর্যালোচনাযোগ্য। আমরা বার বার

বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কথা বলছি, কারণ আমরা দেখেছি এগুলো মূল্যবৃদ্ধির কারণ হয়েছে। আইপিপি, ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিদ্যুৎ আমদানি, এই তিন জায়গায় আমরা দেখেছি যে বিদ্যুতের দাম ক্রমাগত বেড়েছে। সেটার প্রভাব গিয়ে পড়েছে বিদ্যুতের মূল্যে। সে কারণে বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো যে নীতি কাঠামোর আলোকে স্থাপন হয়, সে আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ।

বেসরকারি বিদ্যুৎ বাংলাদেশে বহুভাবে হয়। একটা হলো টেন্ডারের মাধ্যমে আরেকটা হলো ননকম্পিটিভ বা টেন্ডার ছাড়া অর্থাৎ আনসলিসিটেড প্রপোজাল হিসেবে। টেন্ডারের মাধ্যমে যে পলিসির আওতায় হয় সেটা হলো ১৯৯৬ সালের প্রাইভেট জেনারেশন পলিসি। ১৯৯৬ সালে প্রাইভেট জেনারেশন পলিসি যখন হয় তখন বাংলাদেশে সরকারি ক্রয়ের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস ও আইন ছিল না। এটা পরে ২০০৬ ও ২০০৮ সালে হয়েছিলো। সুতরাং ১৯৯৬ সালের প্রাইভেট জেনারেশন পলিসি তার আগে হওয়ায় এটার সাথে আইনের সংযোগ নেই। পরবর্তীতে এ পলিসি পরিবর্তন করেও কোনো আইনী কাঠামো যুক্ত করা হয়নি।

১৯৯৬ সালের পলিসি যেহেতু কম্পিটিটিভ বিডিং, সেহেতু তার বিড ডকুমেন্ট প্রয়োজন হবে না। কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখেছি স্ট্যান্ডার্ডাইজড বিগ ডকুমেন্টগুলা নেওয়া হচ্ছে। একোর্ডিং টু পিপিআর অনুযায়ী। একই সাথে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর জন্য সিকিউরিটি ডকুমেন্টরি প্যাকেজ আছে। যার মধ্যে রয়েছে পাওয়ার পারচেজ এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ড লিজ এগ্রিমেন্ট, ইম্পলিমেন্টেশন এগ্রিমেন্ট, ফুয়েল সাপ্লাই এগ্রিমেন্ট, গ্যাস সাপ্লাই এগ্রিমেন্ট। এগুলো করা হয়েছে ১৯৯৬ সালের পলিসির আওতায়। এই পলিসিতে কিছু ইনভেস্টমেন্ট ইনসেনটিভস দেওয়া আছে। সেগুলো এখান থেকে নিশ্চিত করা হয়। পাওয়ার সেলকে বলা হয়েছিলো সিংগেল উইন্ডো অপারেশন করতে। প্রকৃতপক্ষে পাওয়ার সেল এ কাজটা করে না, কাজটা করে সিঙ্গেল বায়ার।

এখানে আরেকটা বিষয় হলো আনসলিসিটেড প্রপোজাল ননকম্পিটিটিভ বা ননটেন্ডার পাওয়ার জেনারেশন। যেটা হয়ে থাকে স্পেশাল অ্যাক্ট বা দ্রুত জ্বালানি বিদ্যুৎ সরবরাহ আইন ২০১০ এর আওতায়। এই আইনটির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা প্রয়োজন। ২০০৯-১০ সালে যখন বিদ্যুৎ সংকট চরম রূপ ধারণকরেছিলো তখন সে সংকট সামাল দিতে সরকারি সংস্থাগুলো নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টা করছিলো। তারা তখন চিন্তা করলো যে, কনভেনশনাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো আসতে যেহেতু বেশ সময় লাগে তাই এটাকে এভয়েড করে কিভাবে দ্রুত বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা যায়। তাই তারা কনভেনশনাল টেন্ডারিংকে এভয়েড করে অন্যভাবে অর্থাৎ নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের চুক্তি করা যায় কিনা দেখছিলো। এটা একটা বিষয়। আরেকটা বিষয় ছিল, যেহেতু দ্রুত সংকট সামাল দিতে হবে সেহেতু এরকম সময় সরকারি কর্মকতাদের কিছু ভুলের সুযোগ থাকতে পারে সেখানে একটা আইনি সুরক্ষার প্রয়োজন আছে। এ দুটো বিষয় থেকে দ্রুত বিদ্যুৎ সরবরাহের বিশেষ আইন ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছিলো।

আমরা দেখেছি ২০০৮ সাল থেকে অদ্যাবধি ৭৮টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মধ্যে ৩৮টি বিদ্যুৎ

কেন্দ্র টেন্ডার ছাড়া নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে চুক্তি করা হয়েছে। যেহেতু এটা নন টেন্ডার সুতরাং এখানে বিড ডকুমেন্টের প্রয়োজন নেই। এখানে ট্যারিফ নেগোসিয়েশনের ক্ষেত্রে যে রীতিটি অনুসৃত হয়, সেটা কোনো পলিসি বা নীতিতে লেখা নেই। এটা হলো, যে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে চুক্তি করা হবে তার ট্যারিফ হবে পূর্ববর্তী কোনো অনুমোদিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সমান বা তার চেয়ে কম। কিন্তু ২০০৯-১০ সালে যখন আনসলিসিটেড টেন্ডারগুলো চুক্তির আওতায় এলো তখন নেগোসিয়েশনের পরিবেশটা বেসরকারি উদ্যোক্তাদের পক্ষে ছিলো। যে কারণে শুরুর সেই সময়ে ট্যারিফ অনেক বেশি ছিলো। এটাকে রেফারেন্স ধরে যখন একটার পর একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র আসতে লাগলো, তখন সেগুলো ওই বাড়তি দামকেই অনুসরণ করেছে। এটা মূল্যবৃদ্ধির একটা বড় জায়গা। এখানে আমরা দেখি, যে নীতিকাঠামোর ভেতরে বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, একক কোনো আইন বা পলিসি দিয়ে এটা কাভার করা যায় না। এ কারণে যেহেতু পলিসি লিমিটেশন আছে এবং পলিসির অস্বচ্ছতা আছে, তাই কখনো এখান থেকে কখনো সেখান থেকে পলিসি নিয়ে তারা বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর সাথে চুক্তি করছে। এটা হচ্ছে আরবিটারি কাঠামোতে। আরবিটারি কাঠামোর যেহেতু কোনো আইনি কাঠামো নেই, বিশেষ আইন ২০১০ এটাকে সুরক্ষা দেয়। আরবিটারি প্রাক্টিসের একটা বড় সমস্যা হলো এখানে ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ আছে। যে কারণে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো দীর্ঘমেয়াদে, ৫ বছর, ১০ বছর, ১৫ বছর বা কখনো কখনো ২২ বছরের চুক্তির আওতায় চলে আসে। এবং এটা বেশিরভাগ সময় ভোক্তার বিপক্ষে যায়। এই প্রক্রিয়ার কারণে ইফেক্টিভ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত হয় না। ইফেক্টিভ প্রতিযোগিতা যদি নিশ্চিত না হয় তাহলে বলতে পারবো না ভোক্তারা নায্যমূল্যে বিদ্যুৎ পাচ্ছে।

এখানে পলিসিগুলোর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ১৯৯৬ সালের প্রাইভেট পাওয়ার জেনারেশন পলিসিটা বেসরকারি খাতকে প্রতিষ্ঠা করার একটা প্রধান ও প্রথম পলিসি ছিলো। ১৯৯৬ সালের ওই পলিসির আওতায় যখন মেঘনাঘাট ও হরিপুর, এই দুইটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র আসলো তখন এ দুটিকে সফলতা হিসেবে দেখা হতো। এরই প্রেক্ষিতে সরকার শুধু বিদ্যুৎ না, একইসাথে জ্বালানি, অবকাঠামো, যোগাযোগসহ অনান্য খাতেও বেসরকারি খাতকে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাতে থাকে। এবং এর আলোকে পলিসিগুলোর বিবর্তন হতে থাকে। ২০০৪ সালে আমরা দেখেছি প্রাইভেট সেক্টরের ইনফ্রাস্ট্রাকচার গাইড লাইন হয়েছে। এটা আসলে ১৯৯৬ সালের যে পলিসি, তার চেয়ে ভালো পলিসি, ইমপ্রুভড পলিসি। কিন্তু ১৯৯৬ সালের পলিসিটিতে আনসলিসিটেড এগ্রিমেন্টের কোনো সুযোগ ছিলো না। কিন্তু ২০০৪ সালের প্রাইভেট ইনফ্রাস্ট্রাকচার গাইড লাইনে আনসলিসিটেড এগ্রিমেন্টের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। এরপর ২০১০ সালে আমরা দেখেছি পিপিপি পলিসি নেওয়া হয়েছে এবং সর্বশেষ ২০১৫ সালে পিপিপি আইন করা হয়েছে। পিপিপি আইনে আসলে প্রাইভেট সেক্টর অথবা বেসরকারি সেক্টরকে আনা যায়। এই আইনটা অনেককিছু কাভার করে যা আমাদের ১৯৯৬ সালের পলিসিতে নাই। কিন্তু পিপিপি আইনটা থাকলেও এটাকে বেসরকারি বিদ্যুৎখাতে ব্যবহার করা হয় না। এটাকে এভয়েড করা হয় এবং বিশেষ আইন ২০১০

দিয়ে এটাকে প্রটেক্ট করা হয়। একটা ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টুলস হিসেবে মাত্র দুই বছরের জন্য আনা হলেও সেই আইনটি এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ পলিসি টুলস হিসেবে আবর্তিত হয়ে চলেছে। দুই বছরের মেয়াদ পেরিয়ে এখনো সেটা চলছে এবং ২০২৬ সাল পর্যন্ত বর্ধিত হয়েছে।

যে নীতিকাঠামের আওতায় বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো আসছে সেটার যদি সারমর্ম দাঁড় করাই তাহলে দেখতে পাবো, ১৯৯৬ সালের যে প্রাইভেট পাওয়ার জেনারেশন পলিসি, এটা পলিসি রয়ে গেছে কিন্তু আইন হয়নি। যদিও আমাদের ৩০ বছরের বেসরকারি বিদ্যুতের ইতিহাস। আইন থাকলে পলিসির প্রয়োগে অসামঞ্জস্য ধরা পড়লে তার প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণের সুযোগ থাকতো কিন্তু এটার আইন হয়নি। এক্ষেত্রে আমি কয়েকজন নীতিনির্ধারককে ইন্টারভিউ করেছিলাম। ওনারা বললেন, দেখো আইন করে ফেললে অনেক ক্ষেত্রে ফ্লেক্সিবিলিটির সুযোগ কমে যায়। এ কারণে তারা কোনো আইনি কাঠামোতে যাননি। ১৯৯৬ সালের পলিসিতেই বেসরকারি খাতের সঙ্গে চুক্তি হয় এবং এটার পরে আসা ভালো ভালো যতগুলো পলিসি আছে সেগুলাকে এভয়েড করা হয়। কিন্তু ওই পলিসিতে প্রকিউরমেন্ট পলিসি পরিষ্কার ছিলো না এবং এখানে আরবিটারি চর্চার সুযোগ থাকার কারণে এর অপব্যবহারের সুযোগ আছে। ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে যে অল্প সময়ে অনেক তরল জ্বালানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র চলে আসলো বলে আমরা আগে দেখেছি, এটাকে ১৯৯৬ সালের পলিসির একটা অপব্যবহার হিসেবে ধরতে পারি। যার কারণে এখন আমরা অনেক ব্যয়বহুল বিদ্যুতের দায় মেটাচ্ছি।

আর বিশেষ সরবরাহ আইন ২০১০ এর বিশেষ দিক হলো, একটা ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টুলসকে আমরা পলিসি টুলস হিসেবে ব্যবহার করছি। এটা কোনো গুড প্র্যাক্টিস না। এখানে যেহেতু আরবিটারি প্র্যাক্টিস রয়েছে সুতরাং এ আইনটি প্রতিযোগিতাকে উপেক্ষা করে খরচ বৃদ্ধির একটা সুযোগ তৈরি করছে বলতে পারি। ফলে এই আইনটি সরাসরি ভোক্তার যে অধিকার আছে, প্রতিযোগিতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, এর একেবারে বিপরীতে অবস্থান করছে।

এখন আমরা বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রের পেমেন্ট স্ট্রাকচারটা দেখি। ক্যাপাসিটি পেমেন্ট আর জ্বালানি পেমেন্ট এই দুইভাবে তারা পেমেন্ট পেয়ে থাকে এবং সেটা ১৯৯৬ সালের পলিসির অধীনে।

ক্যাপাসিটি পেমেন্টের যে প্রক্রিয়া, তার মধ্যে রয়েছে Return on equity, Fixed cost, Principal instersts, Reserve Accounts. এই সকল বিষয়েই সরকার গ্যারান্টি দিয়ে থাকে তাদের বিনিয়োগের ওপরে। জ্বালানি সরবরাহের ক্ষেত্রেও সব দায় সরকারের। বেসরকারি কোম্পানিকে কেবল উৎপাদন নিয়ে চিন্তা করতে হয়। এই একটা বিষয় ছাড়া বাকি সবই সরকার ভোক্তার অর্থ থেকে জোগান দেয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অপারেশন খরচ হলো প্রজেক্ট খরচের মাত্র ৫ শতাংশ। অর্থাৎ তাদের ইনভেসমেন্টের পুরো অংশ ভোক্তারা রিটার্নের গ্যারান্টি দিয়ে থাকে এবং একইসাথে তাদের কিছু প্রণোদনাও পায়। ১৯৯৬ সালে প্রথম দিকে প্রাইভেট সেক্টরকে উৎসাহিত করার জন্য তাদের বিনিয়োগের ওপর

নানা প্রণোদনার সুযোগ রাখা হয়েছিলো এবং সেটা এখনো বহাল আছে। ১৯৯৬ সালের প্রেক্ষাপট আর এখনকার প্রেক্ষাপট যদিও এক না এবং এখনকার মার্কেট আর তখনকার মার্কেটও এক না। এখন মার্কেট অনেক বেশি পরিণত। তাই এখন এসব প্রণোদনা পুনর্বিবেচনার সুযোগ আছে।

আমরা ঝুঁকি বণ্টনের চিত্র দেখতে পারি, বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র কি পরিমাণ ঝুঁকি নিয়ে থাকে এবং সরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা ভোক্তারা কি ধরনের ঝুঁকি নিয়ে থাকে। আমরা দেখি বেসরকারিখাত বিদ্যমান কাঠামোতে, টু পার্ট ট্যারিফ অর্থাৎ ক্যাপাসিটি পেমেন্ট আর জ্বালানি পেমেন্ট, এ ধরনের কাঠামো এবং যে ধরনের বিনিয়োগ প্রণোদনা দেয়া আছে, তাতে করে বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইম্পলিমেন্টেশন ও অপারেশন, এ দুটি ঝুঁকি বহন করে। ইম্পলিমেন্টেশন রিস্ক হলো প্রজেক্টের সময়সীমা ঠিক সময়ে করা আর অপারেশন রিস্ক হলো বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঠিকঠাকমতো চালানো।

আমরা দেখেছি, যেহেতু বেসরকারি সেক্টরে ৮০ শতাংশ বিদ্যুৎ কেন্দ্রই খুব ছোট ছোট ফলে এখানে আদৌ তাদের কোনো ঝুঁকি নেই। ঝুঁকি তারা কমিয়ে ফেলেছে, একইসাথে তার অপারেশন রিস্ক নানাভাবে ডিস্ট্রিবিউশন করে দিয়েছে। অপরদিকে তারা কোনো মার্কেট রিস্কই নেয় না। এমনকি ডলারের রেটের কারণে যে মূল্য বাড়ে, সেই ঝুঁকিটাও জনগণ বা ভোক্তা বহন করে থাকে। ক্যাপাসিটি পেমেন্টের কারণে ডিমান্ড রিস্কটাও তাদের ওপর বর্তায় না। আবার ফুয়েল প্রাইসের ঝুঁকিও সরাসরি ভোক্তারা নিয়ে থাকে। এসব কারণে আমরা দেখেছি ট্যারিফ বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন খরচ ক্রমাগত বাড়ছে।

আমরা যদি আমাদের সার সংকলন করি, তাহলে দেখব, যে নীতিকাঠামোর মধ্য দিয়ে এই বিদ্যুত উৎপাদন হচ্ছে, তার পলিসি লিমিটেশন আছে এবং এটা অপব্যবহারের সুযোগ আছে। এটা প্রতিযোগিতাকে ব্যাহত করে এবং কম্পিটিশন যদি ব্যাহত হয় তাহলে অবশ্যই ভোক্তারা ন্যায্যদামে বিদ্যুৎ পাবে না। আমরা আরো দেখি যে, অযৌক্তিক মূল্যহারের ক্ষেত্রে আইপিপি, ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ ও বিদ্যুৎ আমদানি, এই কয়েকটা জায়গার দায় রয়েছে। আমরা দেখেছি পিকলোড বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে বেসলোডে চালানো হচ্ছে। আবার অতিরিক্ত বিদ্যুতের জন্য কস্ট ইম্পলিকেশনও ট্যারিফ বৃদ্ধি করেছে। আমরা আরো দেখেছি আমদানিনির্ভর বিদ্যুৎ, অর্থাৎ কয়লা ও তরল জ্বালানি বিদ্যুতের ওপর দীর্ঘসময় ধরে নির্ভরশীল থাকার কারণে ক্রমাগত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আর ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো নির্ধারিত মেয়াদের পর আবার অপারেশনে এসে যখন পুনরায় ক্যাপাসিটি পেমেন্ট নিয়েছে, সেই খরচটা মূল্যবৃদ্ধির একটা কারণ। এবং মার্কেট রিস্ক একটা বড় বিষয়। অধিকাংশ মার্কেট রিস্ক যেহেতু ভোক্তারা নিয়ে থাকে, সব কিছু ভোক্তাদের উপর বর্তায়, সে কারণেও বিদ্যুতের দাম বেড়েছে।

এখন আমরা দেখবো রিনিউয়েবল জ্বালানি কেন আমাদের বাড়াতে হবে। আমরা দেখেছি, বিদ্যুৎ খাত জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভর। আমাদের ৭১ শতাংশ বিদ্যুৎ আসছে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে। ২০১৮ সালের তথ্য মতে, উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের রিজার্ভ আছে আর মাত্র ১১ টিসিএফ। সেই গ্যাস যদি প্রতিবছর ১ টিসিএফ ব্যবহার করি, তাহলে

হয়তো ২০২৬ সাল, অথবা একটু কম ব্যবহার করলে ২০৩০ সালের মধ্যে আমাদের গ্যাস রিজার্ভ শেষ হয়ে যাবে। এখন লোকাল প্রডাকশন যা থাকে সেটাও টোটাল জ্বালানি চাহিদার মাত্র ৫ শতাংশ পূরণ করতে পারে। সুতরাং বাংলাদেশের জ্বালানি খাত চলছে কয়লা আমদানি, তরল জ্বালানি আমদানি বা এলএনজি আমদানি করে। অর্থাৎ আমদানিনির্ভর হয়ে পড়েছে। গ্যাস শেষ হলে যখন পুরোটাই আমদানি নির্ভর হয়ে পড়বে, তখন জ্বালানি সেক্টরের নিরাপত্তা বড় একটা ঝুঁকিতে পড়বে। কারণ আমরা জানি, জ্বালানি নিরাপত্তা তখনই নিশ্চিত হবে, যখন ৫০ শতাংশ জ্বালানির জোগান স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় থাকবে।

একইসাথে আমরা দেখি আমাদের ক্রমাগত বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ছে। আমাদের যেসব বিদ্যুৎকেন্দ্র আছে, সেসব বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মেয়াদকাল যদি বিবেচনা করি, তাহলে দেখব, ২০৩০ সালের মধ্যে ৮ আট হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাবে। আমাদের কিছু গ্লোবাল কমিটমেন্ট আছে প্যারিস এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী, সেখানে গ্রিন হাউজ গ্যাস প্রশমনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। সুতরাং জীবাশ্ম জ্বালানির রিজার্ভ কমছে। আমাদের বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ছে। আবার গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমাতে হবে। এক্ষেত্রে আসলে জ্বালানি নিরাপত্তার কথা চিন্তা করলে আমাদের নবায়নযোগ্য জ্বালানি ছাড়া কোনো বিকল্পই নেই। এখন আমাদের ক্রমাগত নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অবস্থা হলো, মোট উৎপাদন ক্ষমতা মাত্র ১,০০০ মেগাওয়াটের কাছাকাছি। সেখানে অফগ্রিড আছে ৪০০ মেগাওয়াট আর অনগ্রিড আছে ৬০০ মেগাওয়াট। আমরা একটা স্টাডিতে দেখি যে, গ্রিড কানেক্টেড সোলার ফটোভোল্ট পটেনশিয়াল আছে ৫০ হাজার মেগাওয়াট। আর National Renewable Energy Laboratory, যারা বাংলাদেশে উইন্ড ম্যাপিং করেছে তাদের তথ্যমতে, বাংলাদেশে বায়ুবিদ্যুতে ৩০ হাজার মেগাওয়াট উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ মোট ৮০,০০০ মেগাওয়াট সোলার ও উইন্ডো উৎপাদন সম্ভাবনা বাংলাদেশে রয়েছে।

আমরা দেখছি, গ্লোবালি রিনিউয়েবল জ্বালানির মূল্য ব্যাপকভাবে কমে এসেছে। ২০১০ সালের ফটোভোল্ট সোলার ট্র্যাকারের মূল্য প্রতি মেগাওয়াট ৩৭৮ ডলার থেকে কমে এখন ৬৮ ডলার হয়েছে। অর্থাৎ প্রায় ৮০ শতাংশের মতো মূল্য কমেছে। একইসাথে উইন্ডের অনশোর, অফশোর উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ কমেছে। আর নবায়নযোগ্য জ্বালানির মধ্যে নিউক্লিয়ার ধরলে দেখি যে, তার খরচ কিছুটা বেড়েছে।

২০২২ এবং ২০২৩ সালে বাংলাদেশে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের সাপ্লাই খরচ ৯ টাকা ৪৮ পয়সা। আর ২০২২-২৩ সালে সৌরবিদ্যুতে বেসরকারি একটি বিদ্যুৎ কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিতে আমরা দেখেছি বিদ্যুতের দাম ৯ টাকা ৯০ পয়সা ধরা হয়েছে। ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে একটা বায়ুবিদ্যুতের চুক্তি হয়েছিলো ১৩ টাকা ২০ পয়সা প্রতি ইউনিট দরে। অর্থাৎ আমরা দেখছি, জীবাশ্ম জ্বালানির প্রায় কাছাকাছি খরচ নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে। তবে এক্ষেত্রে খুব ছোট মাত্রার উৎপাদনের কারণে হয়তো খরচ বেশি পড়ছে। হয়তো ব্যাপকহারে উৎপাদনে গেলে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ট্যারিফ আরো কমে আসবে। যার উদাহরণ আমরা দেখছি ভারতে।

ভারতে বর্তমানে সোলার বিদ্যুৎ প্রতি ইউনিট ৩ রুপিতে মিলছে। তাদের ধারণা মতে, এটা ২০৩০ সালের মধ্যে ২ রুপিতে চলে যাবে এবং উইন্ডের প্রতি ইউনিটের খরচও ৩ রুপি। সেটাও ২০৩০ সালে ২ রুপিতে চলে যাবে। অর্থাৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানির ক্ষেত্রে ভারত আমাদের উদাহরণ হিসেবে থাকবে। কারন তারা আসলে রিনিউয়েবল জ্বালানিতে প্রচুর উন্নতি করেছে। ফলে উৎপাদন বেড়েছে। তাদের ব্যয়ও কমে আসছে। বাংলাদেশে আসলে রিনিউয়েবল জ্বালানি অফট্র্যাক হয়ে আছে। এখানে একটা বিগ পুশের প্রয়োজন আছে। আমরা আসলে ১০ শতাংশের বেড়াজালে আটকে আছি। ২০০৮ সালে যখন রিনিউয়েবল জ্বালানির পলিসি নেওয়া হয় সেখানে টার্গেট দেওয়া হয়েছিলো ২০২০ সালের মধ্যে মোট উৎপাদন ক্ষমতা হবে ১০ শতাংশ। পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্লান ২০১৬ সালে যখন রিলিজ করা হয় সেখানেও দেখা যায় ২০৩০ সালের মধ্যে ১০ শতাংশ। ২০৩০ সালে তখনকার যে উৎপাদন হবে তার ১০ শতাংশ। অর্থাৎ জ্বালানি নিরাপত্তা বিবেচনা করে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে কখনোই ফসিল ফুয়েলের যোগ্য বিকল্প হিসেবে ভাবা হয়নি।

এমনকি আমরা যদি এসডিজি গোল দেখি, এসডিজি গোল সেভেনে ২০৩০ সালের ভেতরে সবার জন্য ক্লিন জ্বালানি নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এখানে যে দুইটা ইন্ডিকেটর আমরা নিজেরা ঠিক করেছি একটা হলো ২০৩০ সালের ভেতর শতভাগ বিদ্যুৎ অ্যাকসেস, এটা অলরেডি নিশ্চিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় টার্গেট ছিলো উৎপাদন ক্ষমতার ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি হবে। অথ্যাৎ আমরা ২০৩০ সাল নাগাদ মাত্র ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানির বেড়াজালে নিজেদের আটকে রেখেছি। অথচ ইতিমধ্যে এর উৎপাদন ব্যয় কমতে শুরু করেছে। এটাই বৈশ্বিক ট্রেন্ড। আশেপাশের দেশগুলোও সহজভাবে নবায়নযোগ্য খাতে এগিয়ে গেছে। তাদের উদাহরণ থেকে দেখছি, এই ব্যয় ক্রমাগত কমবে। এদিকে ফসিল ফুয়েলের দাম প্রতিনিয়ত বাড়ছে। সুতরাং নবায়নযোগ্য জ্বালানিই হলো আমাদের জ্বালানি নিরাপত্তার সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মোস্তাফিজুর রহমান দুলাল
সভাপতি, ক্যাব, নীলফামারী জেলা কমিটি

আমরা যারা মাঠপর্যায়ের কর্মী জনগণের কাছে ভোক্তাদের অধিকারের কথা বলি, কনজুমারস এসোসিয়েশনকে গণমানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চালাই এবং তাদের অধিকারের কথা বলি। আমাদের কাছেও কিছু প্রশ্ন আসে। আজকে আপনারা আমাদের ডেকেছেন। আপনাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন, আপনারা কি জানেন, এ বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা কতটুকু। নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়নে আজকের যে প্রশিক্ষণ এতে অংশ নিতে যেটুকু প্রাথমিক অভিজ্ঞতা দরকার, তা অন্তত আমার নাই। পাশের লোকদের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, আমরা অনেকেই এ বিষয়গুলো বুঝতে পারছি না। আপনাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, আপনারা এরপর যেকোনো প্রশিক্ষণ বা সেমিনার করেন, সেখানে যেন আমরা

অংশগ্রহণ করে সব বুঝতে পারি, সেরকম ব্যবস্থা করবেন। ধন্যবাদ।

অধ্যাপক এম শামসুল আলম
জেষ্ঠ্য সহ-সভাপতি, ক্যাব, কেন্দ্রীয় কমিটি

প্রথমত, আজকে প্রথম যে বিষয় আপনাদের সামনে আনা হলো সেটা পুরোপুরি টেকনিক্যাল আর পলিসি বিষয়ক। এই ব্যাপারটা তৃণমূল পর্যায়ের কাছে খুব জটিল মনে হওয়া স্বাভাবিক। তবে আরো দুটি পেপার আছে, সেগুলো জানার পরে আপনাদের বোঝাপড়া আরো পরিষ্কার হবে। দ্বিতীয়ত, আজ ক্যাব প্রণীত জ্বালানি রূপান্তর নীতিমালার ব্যাপারে আপনাদের মোটামুটি ওরিয়েনটেশন দেওয়া হচ্ছে। নীতিমালার বইটা আপনাদের দেওয়া হয়েছে। না পেলে পাঠানো হবে। অনলাইনেও এই বই থাকার কথা। তবে এ বিষয়টি আপনাদের বোঝার জন্য যতটা না, তার চেয়ে আমাদের প্রস্তুতিটা বোঝানো মূল বিষয়। আমরা যারা এ আন্দোলনটা লিড করছি, তাদের কতটুকু প্রস্তুতি আছে, সে বিষয়ে কনফিডেন্স নিয়ে আপনারা ফিরে যাবেন। আমাদের প্রস্তুতিটা কোনো জায়গায় সেটা বোঝা দরকার। চীন, ভারত এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, তারপর রাশিয়া, আমেরিকার বিভিন্ন কোম্পানি সবাই এ সেক্টরের দিকে আগাচ্ছে এবং বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মুনাফা এখানে আছে। সুতরাং সে মুনাফা নেবার জন্য সবাই এখানে আসছে। যে এখানে আসবে সেই মুনাফা পাবে, মুনাফা নিয়ে যেতে পারবে কিন্তু কোনো ঝুঁকি থাকবে না। আর এই সব ঝুঁকি বহন করবে ভোক্তা অর্থাৎ দাম বাড়িয়ে বা সরকারি ভর্তুকি বাড়িয়ে। এখন আমাদের আইন কানুন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় নীতিমালা যে এদের ঠেকানোর উপযোগী না। যা আছে তারও সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। এই বিষয়টাই আপনাদের বুঝতে হবে। ক্যাবের কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে যে, এর বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিতে সক্ষম, এটা আপনাদের বুঝতে হবে।

কাজটা কি করতে হবে? একটা লড়াই করতে হবে। এর থেকে বের হয়ে আসতে হবে। সরকারকেও আমাদের এ লড়াইয়ে দরকার। কারণ সরকার এ সমস্ত পলিসির কারণে ফাঁদে পড়ে গেছে। এখন সরকারকে বোঝানোর জন্য, শক্তি দুরকম। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আপনারা যেমন পাইপলাইনে গ্যাস রপ্তানি ঠেকিয়েছেন। এখন সে গ্যাস আর উঠছে না আর রপ্তানিও হচ্ছে না। মানে এটা আর তোলা হচ্ছে না। এখানে আমাদের সবাইকে আন্দোলনে যেমন থাকতে হবে, তেমনি পলিসি টেবিলে, আদালতেও থাকতে হবে। আমরা সে কাজটা পারব কিনা এটা আপনাদের বুঝতে হবে।

আপনি আপনার ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়েছেন, সে ডাক্তারি অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, আপনি তো সেগুলোর কিছুই বোঝেন না। কিন্তু এটা আপনার বিশ্বাস আছে, আপনার ছেলে যদি ডাক্তারি পাস করে বেরিয়ে আসে সে আপনাকে স্বস্তি দিতে পারবে, দেশের কাজে লাগবে। কিন্তু আপনি ডাক্তারি বুঝবেন না। আমরা আপনাদের ডেকেছি, আমরা যেসব কাজ বছরের পর বছর ধরে করে আসছি তা আপনাদের জানাতে। আদালতে গিয়ে আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারি কিনা। এবং সেটা যদি করে থাকি, আমরা আপনাদের বুঝিয়ে

সরকারের পলিসি টেবিলে বসে আলোচনাটা চালিয়ে যাচ্ছি। সেটা আপনারা দেখে যান।

আপনারা সেনাবাহিনী পালেন পয়সা দিয়ে। সেনাবাহিনী কি যুদ্ধ করে বা যুদ্ধ শেখে সেটা কি জানেন? জানেন না। কিন্তু বিশ্বাস রাখেন আপনার সার্বভৌমত্ব তারা রক্ষা করবেই। যাকে আপনারা পয়সা দিচ্ছেন, কর দিচ্ছেন। আজকে আপনাদের ডেকেছি এটা বোঝানোর জন্য। আপনারা বোঝার চেষ্টা করেন যে, যারা আজকে এগুলো নিয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছে, সরকারের পলিসির চেঞ্জগুলো হয়ে যাচ্ছে, সেটা মোকাবিলা করার মতো তাদের জ্ঞান আছে কিনা। তারা সেটা বোঝে কিনা। রাজনৈতিক দলের কর্মীদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখেন তো, তারা রাজনীতির পলিসি বোঝে কিনা? সে পলিসি বোঝে না। তবে সে এটুকু বোঝে আমি যে নেতার পিছনে আছি, দলের পিছনে আছি, সে দল আমাকে সুরক্ষা দেয়, দেশকে সুরক্ষা দেয়, পার্টিকে সুরক্ষা দেয়, কল্যাণ নিশ্চিত করে। কিভাবে করে, তার মধ্যে আন্তরিকতা আছে, ডেডিকেশন আছে, দ্যাটস ইট।

আজকে যে আলোচনা আছে, আলোচনায় দেখেন যে সমস্ত আইনে বিপর্যয় ঘটেছে, আমরা সেসব জায়গায় কিভাবে জ্বালানি রাইট, ভোক্তার রাইট প্রটেকশনের জায়গায় কাজ করছি। অন্য সমস্ত রাইট প্রটেকশন না হলে যতখানি ক্ষতি হয়, জ্বালানি রাইট সুরক্ষিত না হলে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি ক্ষতি হয়। এখানটাতেই আমরা কাজ করছি। আপনারা খুঁটিনাটি টেকনিকাল বিষয় না বুঝলেও আলোচনা থেকে আমাদের কাজের ধারাটা বুঝতে পারবেন। এটাই আপনাদের শক্তি জোগাবে এবং আমাদের এগিয়ে দেবে।

প্রবন্ধ উপস্থাপন
ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ

প্রবন্ধের শিরোনাম: Energy Justice: Legal Mapping of Consumer's Right to Energy and Environment.

শুভ সকাল, সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

একটা কঠিন বিষয়ের উপর দিয়ে এখন আমরা পথ চলবো তার জন্য সবাই ধৈর্য্য ধরে আছি। আবার অত কঠিন না মানে ব্যাসিক জিনিসটা খুবই সিম্পল। অতকিছু আমাদের বোঝার জন্য একটু সময় দরকার। কিন্তু আজকে আমরা যে প্রবন্ধটা উপস্থাপন করছি, সেটি জ্বালানি জাস্টিসের উপর। জাস্টিস শব্দটার মানে নায্যতা বা ন্যায়। মানে কখন আমরা বলবো, জ্বালানির ক্ষেত্রে ন্যায় হয়েছে। অন্যায় বা অন্যায় হলে আমরা যাতে বুঝতে পারি, সে সময় এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে, সংগঠিত হতে হবে।

আমাদের আন্দোলন করতে হবে। সুতরাং আমরা যদি এ ন্যায় অন্যায়ের ফারাক না বুঝি। সাদা আর কালোর মধ্যে ফারাক না বুঝি। তাহলে কিন্তু মুশকিল। আমাদেরকে ভোক্তা হিসেবে সে জায়গাটাকে বোঝার জন্য পেপারটা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো। কিছু

টেকনিক্যাল দিক আছে। একদম চিন্তিত হবেন না, এই টেকনিকাল অনেক কিছু আমিও বুঝি না। আপনাদের বুঝতে হবে এমন কথা নেই। তবে মূল যে বিষয়টা সেটা আপনাদের নিয়ে যেতে হবে। কেন আমরা পারছি না, এটাই হচ্ছে বড় কথা।

আজকে আমার উপস্থাপনায় দেখার চেষ্টা করবো জ্বালানি জাস্টিস কে আমরা কিভাবে দেখবো আইনের দৃষ্টিতে। আইন কি বলছে, আর কি হতে দেখছি, আমরা কি পেতে পারি। তাহলে আমরা বুঝতে পারবো আমাদের সাথে জ্বালানি বিষয়ক ন্যায় হয়েছে কিনা। বিশেষ করে জ্বালানি জাস্টিস দেখার জন্য আমরা কিন্তু কাজ করবো ভোক্তাদের যে অধিকার রয়েছে জ্বালানি এবং এনভায়রনমেন্টের উপরে, তার ভিত্তিতে। জ্বালানি জাস্টিস শব্দটায় ন্যায়ের কথা যখন আমরা বলি, তখন কিন্তু অনেক বড় একটা বিষয় আমরা হাতে নিচ্ছি। কারণ ন্যায় শব্দটার ব্যাপকতা অনেক। আপনি ভাবছেন, এ রুমে এসি থাকাটা আমার ন্যায়গত অধিকার। আরেকজন ভাবছে, এসি না থাকলে চলবে। আমার ফ্যান থাকলেই চলবে। এটা আমার ন্যায়গত অধিকার। অনেকে ভাবছে, অন্তত পক্ষে জানালাগুলো খোলা থাক, তাতেই আমার ন্যায়গত অধিকার। এরকম তারতম্য রয়েছে ন্যায়ের ধারণায়। আমরা যখন ন্যায় কথাটা বলি বা বলি আমার সাথে অন্যায় হয়েছে, তখন এই ন্যায় অন্যায়ের ফারাকটা মোটামুটি নিজেরা নিজেদের অবস্থানের প্রেক্ষিতে বোঝার চেষ্টা করি।

আমি মনে করি, এখানে একটা সিংহাসন থাকলে আমি আজকে বক্তৃতা দিতে স্বাছন্দ্যবোধ করতাম। তো সিংহাসন নাই দেখে ভাবলাম আমার সাথে অন্যায় করা হয়েছে। তো আরেকজন ভাবছে, আমার তো সিংহাসন দরকার নাই। আমাকে একটা পাটি বিছিয়ে দিয়ে যদি প্রেজেন্টেশন করতে দেয় তাতেই হলো। সেটুকু যদি না দেয়, তাহলে সেটা অন্যায় হবে। ন্যায় অন্যায়ের ফারাকটা কিন্তু এরকম জায়গাতে খুব সূক্ষ্ম। এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে।

জ্বালানি নিয়ে যখন আমরা ন্যায়ের কথা বলবো আমরা মূলত বুঝবার চেষ্টা করবো এমন ধরনের অধিকার, যেটা আমার জ্বালানি প্রাপ্তির অধিকারকে সুরক্ষিত করবে। এবং পরিবেশের যদি কোনো বিপর্যয় হয় সেটা আমি যাতে মোকাবিলা করতে পারি। একটু পরে আমরা আলোচনা করবো, কেন জ্বালানি আর পরিবেশ একসাথে জড়িত। এখন জ্বালানির যে সোর্সগুলো আছে আমি চাইলে একসাথে একবারে সব কিছু শেষ করে দিতে পারি। আমি বিক্রি করে দিতে পারি, আমি অবহেলা করে শেষ করে দিতে পারি। আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। কারণ আমার জ্বালানি প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে। সুতরাং আমি এটা করতে পারি। কিন্তু আমার ভবিষৎ প্রজন্মের জন্য আমি কি কিছু রাখছি? আমরা পরিবেশকে এমনভাবে নষ্ট করে যাচ্ছি, যেখান থেকে আমার ভবিষৎ প্রজন্ম কোনো অধিকার পাচ্ছে না। তাহলে তো জ্বালানি জাস্টিস নিশ্চিত হচ্ছে না। সুতরাং জাস্টিস কথাটির সাথে ব্যক্তির জাস্টিস কথাটার যখন তুলনা করছি, সাথে সামষ্টিক জাস্টিসের কথাও চিন্তা করতে হবে। কারণ আমি একা শুধু বেঁচে থাকবো, আমি একাই শুধু ভোগ করবো, তা কিন্তু ভোক্তা অধিকারের মূল কথা নয়। ভোক্তা অধিকারের মূল কথা হলো, সামষ্টিকভাবে আমরা ভালো আছি কিনা। কিছু কিছু লোক তো ভালো থাকে। অনেকের বাসায় ইলেকট্রিসিটি না থাকলেও

হাই পাওয়ারের জেনারেটর থাকে। তারা বোঝেই না দেশে কখন কারেন্ট আছে বা নাই। কিন্তু একদম গরিব ঘরে, যেখানে সেচের কাজ চলছে, সেখানে যখন ইলেকট্রিসিটি থাকে না, সেখানে তারা প্রতিমুহূর্তে বোঝে তারা বঞ্চিত হচ্ছে তাদের অধিকার থেকে। সুতরাং আমরা সামষ্টিক দিকটা খুব ভালো করে মনে রাখবো।

জ্বালানি জাস্টিসের একটা গালভরা সংজ্ঞা আছে। সেই সংজ্ঞাটা দেখতে মনে হয় গালভরা, কিন্তু আসলে এতো কঠিন কিছু না। এটা আসলে আমরা সবাই বুঝি। এটা কতগুলো শব্দ। আমি আমার জ্বালানি নিরাপত্তা চাই, আমার জন্য, আমার ভবিষৎ প্রজন্মের জন্য। কোনো বিঘ্ন ঘটা যাবে না, আমার কাছে এমন জ্বালানি সাপ্লাই হবে এবং সেটা পরিবেশবান্ধব হতে হবে। আমি আমার পরিবেশের বারোটা বাজিয়ে যদি আন-ইনটারাপ্টেড এনার্জি এনশিওর করি তাতে আমার পরিবেশ নষ্ট হবে। এটার ফল শুধু ভবিষ্যৎ প্রজন্ম না, আমার আপনার জীবদ্দশাতেও এটার ভুক্তভোগী হতে হবে। নানারকম সমস্যা সৃষ্টি হবে।

মূল্য নির্ধারণে জাস্টিস একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। জ্বালানি তো আর আপনি ফ্রিতে চাচ্ছেন না, আপনি চাচ্ছেন ফেয়ার আর রিজেনেবল প্রাইসে। যে দামটাও আবার সহনীয় হতে হবে। এখন আমাকে বলা হচ্ছে, তোমাকে জ্বালানি দেওয়া হলো, ১ কোটি টাকা করে মাসে দিতে হবে। এটা তো আমার পক্ষে সম্ভব না, আপনার পক্ষে সম্ভব না। তাহলে জ্বালানি জাস্টিস হলো না, জাস্টিস হবে জ্বালানি মূল্যমান যাতে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ এবং যৌক্তিক হয়।

এখানে যেহেতু আজকে আমি বলেছি, আইনের কিছু দিক আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। যারা আইনজীবী, তারা হয়তো বিষয়গুলো সহজে বুঝবেন। তবে আমার এই উপস্থাপনা সবার জন্য, যারা আইনজীবী না, তাদের বোঝার জন্য। সুতরাং এখানটাতে একেবারেই ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আইন আমাদের দরকার, আমরা শুধু চাই বললে তো হবে না। কিন্তু আমার অধিকারটা কোথায় প্রাপ্য, কোথায় ভঙ্গ হচ্ছে, অন্তত পক্ষে সেগুলো যদি জানি, তাহলে কিন্তু খুব সহজভাবে আমি জায়গাগুলোতে ধরে নেয়ার চেষ্টা করতে পারবো।

প্রথমেই আমি আসি, সংবিধানের কথায়। কেন সংবিধানের কথা নিয়ে আলোচনা করছি। সংবিধান হচ্ছে আমার দেশের সর্বোচ্চ আইন। এই আইনে যা বলা হয়েছে, সেটাই কিন্তু আমাদের জন্য একদম শিরোধার্য। এই আইনের সাথে যদি কোনো আইন অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে যেটুকু আইন অসামঞ্জস্যপূর্ণ তা বাতিল বলে গণ্য হবে। এটা কিন্তু সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদে বলা আছে। সুতরাং প্রথমেই আমরা বোঝার চেষ্টা করবো, এই যে জ্বালানি জাস্টিসের কথা বলা হয়েছে, জ্বালানির ন্যায্যতা নিয়ে কথা বলছি, এ নিয়ে আমাদের সংবিধান কি বলছে? সংবিধান কি ন্যায়ের কথা বলছে, নাকি সংবিধান এড়িয়ে চলছে। প্রথমেই আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদের দিকে। ১৪৩ মনে রাখতে হবে, এমন কিছু না। শুধু জানতে হবে এটা সংবিধানে আছে। আলাপ উঠলে শুধু বলবেন এটা সংবিধানে আছে, আমাকে জিজ্ঞেস করেন কেন, খুঁজে দেখেন সংবিধানে আছে।

সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদ বলছে, আমাদের জ্বালানি ও মিনারেল রিসোর্স, তা জমিতে

বা সাগরে যেখানেই হোক, সেটার মালিকানা, সেটার মালিক হচ্ছে আমাদের প্রজাতন্ত্র। প্রজাতন্ত্রের মালিক কে? জনগণ। ৭(১) অনুচ্ছেদ এই স্বীকৃতি দিচ্ছে। সেখানে প্রজাতন্ত্রের মালিক যদি জনগণকে বলা হয়, তাহলে খনিজ পদার্থ ও জ্বালানি শক্তির মালিক প্রজাতন্ত্র বলা হলে কি হচ্ছে? জনগণ হচ্ছে মালিক আমাদের জ্বালানি ও খনিজ পদার্থের। এটা নিয়ে দ্বিমত থাকার কোনো জায়গা নেই। এটা একেবারে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। তো প্রথমত বোঝা গেল, আমরাই মালিক। জনগণ মানে আমরা আরকি। এখানে প্রজাতন্ত্রের মাধ্যমে আমরাই মালিক।

আমাদের সংবিধানে কতগুলো ভাগ রয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতিসমূহ। এতে অনুচ্ছেদ ৮ থেকে ২৫ পর্যন্ত আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার কতগুলো মূলনীতির কথা বলা হয়েছে। আমাদের রাষ্ট্র এই মূলনীতির বিপরীতে গিয়ে কোনো কাজ করবে না। এই মূলনীতিগুলো মেনেই রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে। এখানে মৌলিক অধিকারের একটি ভাগ রয়েছে। মৌলিক অধিকার হলো, যেগুলোকে আপনি কোর্টে বলবৎ করতে পারেন। তার মানে হলো, যদি আজকে আপনি সে অধিকার বঞ্চিত হোন আপনি একটা রিট করতে পারেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ক্ষেত্রে যদি আপনি বঞ্চিত হোন তাহলে আপনি কি করবেন?

এ ব্যাপারে ৮(২) অনুচ্ছেদে খুব সুস্পষ্টভাবে বলা আছে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে যে ধারাগুলো আছে সেগুলো থেকে যদি আপনি বঞ্চিত হন তাহলে আপনি সেগুলো আদালতে বলবৎ করতে পারবেন না। এবং এই কথাটি আবার কুদরতে এলাহি বনাম বাংলাদেশ খুব নামকরা একটি মামলা, এই মামলায় আপিলেট ডিভিশনের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে একই কথা যে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি আমরা বলবৎ করবো না। খুবই দুঃখজনক, আপনি পেলেন না। রাষ্ট্র পরিচালনা করতে মূলনীতি ভঙ্গ করলে আপনি আদালতে বলবৎ করতে পারলেন না। খুবই খারাপ, এইরকম কাজ হওয়া উচিত না। কিন্তু আমরা কি করতে পারি, আমাদের হাত পা তো সংবিধান দিয়ে বাঁধা। কুদরতে এলাহির মামলায়ও উচ্চতর আদালত এ রায়টি দিয়েছে। এ পয়েন্টে আবার ফিরে আসবো।

আমরা আরেকটু দেখি, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে কি বলা হয়েছে জ্বালানি আর পরিবেশ নিয়ে। প্রথমেই আমরা বলছি, ১৩ অনুচ্ছেদের কথা। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের যা কিছু প্রডাকশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন, তার যে উপাদান ও পদ্ধতি রয়েছে সেগুলো কন্ট্রোল করবে পিপলস অব বাংলাদেশ। দেখেন আমরা কিন্তু পিপলস অব বাংলাদেশ ১৪৩ এও পড়লাম। কিভাবে তারা জ্বালানি ও খনিজ ও পদার্থের মালিকানা রাখে। এখানে বলছে, যা কিছু প্রডিউস আর যা কিছু ডিস্ট্রিবিউশন করা হয় বা যেভাবে প্রডিউস করা হয়, তার যা ইন্সট্রুমেন্ট, মিনস, তার সব কিছু কন্ট্রোল করবে পিপল অব বাংলাদেশ। তার মানে আপনি একটা বিল্ডিং বানাচ্ছেন এখানে যদি ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করেন সেটা মিনস অব প্রডাকশনের মধ্যে পড়ছে। এখন কথা হচ্ছে, আমাদের মিনস অব প্রডাকশন ডিস্ট্রিবিউশন করে জনগণ। তাহলে জ্বালানি নিশ্চয়ই একটা ফ্যাক্টর। যেকোনো প্রডাকশনের ক্ষেত্রে, যেকোনো ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে আমরা নানাভাবে জ্বালানি ব্যবহার করি। আর্টিকেল

১৩তে সুস্পষ্টভাবে বলছে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতিতে রাষ্ট্রকে মনে রাখতে হবে, এগুলোর মালিকানা হচ্ছে জনগণের।

আর্টিকেল ১৫ তে কিন্তু আবার বলছে, আমাদের মৌলিক চাহিদার কথা। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, এগুলো নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আবার বলছি, বলবৎ করা যাবে না। রাষ্ট্রের মূলনীতির ভেতর এটা থাকতে হবে। রাষ্ট্র যদি বলে, দেশে কোনো খাদ্য উৎপাদন হবে না। শুধুমাত্র অস্ত্র উৎপাদন হবে। রাষ্ট্র এটা করতে পারবে না। আর্টিকেল ১৫ অনুযায়ী রাষ্ট্র এটা করতে পারবে না। কারণ রাষ্ট্রের কাজ আমার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এগুলো নিশ্চিত করা। যদি বলে বাসস্থানের দরকার কি, সবাই খোলা ছাদের নীচে থাকবে। আকাশের নীচে থাকবে, বাঁচলে বাঁচলো মরলে মরবে। ঝড়ে মরবে পানিতে মরবে আমাদের কি করণীয় আছে। আমাদের এখন বিল্ডিং করতে গেলে জায়গা অনেক লাগে। তাই এখানটাতে এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন বানিয়ে দিচ্ছি। রাষ্ট্র এটা করতে পারবে না কারণ রাষ্ট্রের যে মূলনীতি এটা হলে সেখান থেকে সরে আসবে। এখানে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা যেকোনো কাজেই কিন্তু আমাদের জ্বালানি দরকার হয়। তাহলে জ্বালানির অধিকারকে অস্বীকার করে আমরা অন্য কোনো মূলনীতিকে সমর্থন করতে পারি না।

আর্টিকেল ১৬ আরো মজার একটা আর্টিকেল। আর্টিকেল ১৬ বলছে, রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো গ্রাম আর শহরের মধ্যে বৈষম্য বা দূরত্ব কমিয়ে আনতে হবে। এটা রাষ্ট্রের একটা দায়িত্ব। তো রাষ্ট্রের যদি সেটা দায়িত্ব হয় আপনি যদি জ্বালানির ব্যবস্থা, পল্লী বিদ্যুতায়ন না করেন আপনি কি করে মনে করেন গ্রামের সাথে শহরের দূরত্ব কমে যাবে। রাতে একটা বাল্ব একটা পরিবারের জন্য কত বড় একটা বিষয়, যারা গ্রামে কাজ করি আমরা বুঝি। ওই পরিবারটা পড়তে পারছে, রান্না করতে পারছে, মহিলাদের সুবিধা হচ্ছে, অনেক কাজ হয়ে যাচ্ছে। না হলে কি হচ্ছে, সন্ধ্যা ৭টা থেকে ওই ঘরে কোনো কাজ হচ্ছে না। নানারকম অর্থনৈতিক কাজ হয়। সুতরাং অনুচ্ছেদ ১৬ একটা জায়গা যেখানে জ্বালানি নিশ্চিত করতে হবে। ১৮(ক) অনুচ্ছেদ পঞ্চদশ সংশোধনের পরে সংবিধানে সংযুক্ত করা হয়েছে। যেখানটাতে আমাদের ব্যাসিক ইকো সিস্টেম, পরিবেশকে প্রটেকশন দেয়ার বিষয়ে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। মূল কথা হচ্ছে পরিবেশের উপর আমাদের যে অধিকার রয়েছে সেটা কিন্তু আর্টিকেল ১৮(ক)-তে রয়েছে। ১৮(ক) কিন্তু আমাদেরকে বলছে, রাষ্ট্র এমন কিছু করবে না, যেখানে জ্বালানির অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হবে অথবা আমার পরিবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে। তাহলে মোটামুটি জানা গেল, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে বিভিন্ন জায়গায় ১৩ তে, ১৫ তে, ১৮(ক) অনুচ্ছেদে জ্বালানির অধিকারের কথা বলা হয়েছে, পরিবেশের কথা বলা আছে।

এবার আমরা আসি, সে ৮(২) এর কথায়। সেখানে তো বলেছে, আমরা এইগুলো বলবৎ করতে পারবো না। এগুলো জেনে আমরা কি করবো যে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি থাকবে। কুদরত এ এলাহীর মামলায় তো বলেই দিয়েছে, তারা ৮(২)-এর বাইরে যাবে না। যেহেতু বলবৎ করার বিষয় আছে। কোর্ট বলেছে, আমরা এইগুলো বলবৎ করবো না।

রাষ্ট্র পারলে দেবে, না দিতে পারলে আদালত বলবৎ করতে পারবে না।

কিন্তু আপনারা কি জানেন একটা দিগন্ত সৃষ্টিকারী পরিবর্তন আমাদের উচ্চ আদালত করেছে। আদালতও কিন্তু আইন বানায়। সেরকম আদালতের কয়েকটি মামলার রেফারেন্স আমরা দিয়েছি। যেমন লাকি ওয়াহাব বনাম সেক্রেটারি মিনিস্ট্রি অব ল্যান্ড ১৯৯৬ সালে এবং বিশেষ করে মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ বনাম বাংলাদেশ ২০১০ সালে এবং হিউম্যান রাইটস ফর পিস ফর বাংলাদেশ বনাম বাংলাদেশ ২০১১ সালে। এই ৩টি মামলাতে কিন্তু কোর্ট ৮(২) থেকে সরে এসেছে। শুধু ৮(২) থেকে সরে আসা না, এই তিনটা মামলাই কিন্তু হাইকোর্ট বিভাগের। তারা উচ্চ আদালতের রায়কে অনুসরণ না করে ভিন্ন পথে চলে গিয়েছে। তারা বলছে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি পালনে রাষ্ট্রকে বাধ্য করা সম্ভব। অল্প মানুষই এটা জানে, এই মামলাগুলোকে নিয়ে সেইরকম আলোচনা হয় না। শফিউল্লার কেইসটাতে ২০১০ সালের মামলাতে সরকার কখনো আপিলও করেনি যে, এইরকম একটা রায় পেলাম যেখানে ৮(২) বাতিল হচ্ছে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলবৎ করার কথা বলছে, এখানে তারা কিন্তু আপিলও চায়নি। তার মানে হচ্ছে, আমাদের হাইকোর্ট ডিভিশন ৮(২) কে বাতিল করেছে এবং বলেছে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিও বলবৎ করা সম্ভব।

তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য প্যান্ডোরার বক্স খুলে যাচ্ছে। আমরা যে জ্বালানি অধিকার নিয়ে কথা বলছি, আমরা যে পরিবেশের অধিকারের কথা বলছি, সেখানে যদি আর্টিকেল ১৩, ১৫, ১৮ এ কোনো কিছুতে যদি দেখি রাষ্ট্র আমাদের বিরুদ্ধচারণ করছে বা এমন কোনো পলিসি বানিয়ে ফেলছে বা এমন কোনো আইন বানিয়ে ফেলছে, যেটা নাকি আমাদের বিরুদ্ধে তাহলে আমরা কিন্তু কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারবো। কিন্তু তার জন্য আমাদের একত্রিত হতে হবে। আমাদের একসাথে মুভমেন্ট করতে হবে। আমাদের আইনে কিন্তু অধিকার আছে, আমাদের শুধুমাত্র একত্রিত হওয়াটাই জরুরি। আমরা যদি বসে থাকি, ধুর কি হবে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলবৎ করা সম্ভব না, তাহলে কিন্তু চলবে না। আমাদেরকে সোচ্চার হতে হবে।

এখন আমি চলে যাচ্ছি জ্বালানি অধিকার আর মৌলিক অধিকারের আলোচনায়। ইতিমধ্যে আমরা বললাম মৌলিক অধিকারের কথা, যেগুলোকে বলবৎ করা সম্ভব। আমাদের মোট ১৮টি মৌলিক অধিকার রয়েছে সংবিধানে। এটা সত্য এই ১৮টি অধিকারের মধ্যে কোথাও কিন্তু মানে পরিস্কারভাবে আমাদের জ্বালানি অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। এটাকে কিন্তু অনেক দেশেই জ্বালানি প্রাপ্তির অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের সংবিধানে সেটি করা হয়নি। তাই বলে কি আমরা থেমে থাকবো? না। আমাদের উপায় আছে। যত কঠিন হোক পথ কিন্তু আমরা বের করে ফেলবো।

৩১ ও ৩২ অনুচ্ছেদ আমাদের মৌলিক অধিকার। সেখানে কিন্তু আমাদের বলা হয়েছে জীবন যাপনের অধিকার, জীবনের অধিকার। ১৯৯৭ সালে মহিউদ্দিন ফারুক বনাম বাংলাদেশ মামলাতে সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়েছে বা বলছে, রাইট টু লাইফ মানে শুধুমাত্র নিঃশ্বাস নেওয়া আর ছাড়া না। মানে আমি নিঃশ্বাস নিচ্ছি, ছাড়ছি আর বেঁচে আছি। তার মানে এটাই আমার অধিকার, তা না। রাইট টু লাইফের সাথে তারা কিন্তু কোয়ালিটিটিভ

কিছু জিনিসের কথা যোগ করেছে যে, রাইট টু লাইফ মানে আমি পরিবেশ দূষণ থেকে মুক্ত থাকবো, আমি শব্দ দূষণ থেকে দূরে থাকবো, এটা আমার অধিকার।

এখন শুধু বললে হবে আপনাকে এখানে যন্ত্রের মতো বসিয়ে রাখছি। নিঃশ্বাস নিচ্ছেন, জ্বি নিচ্ছি, নিঃশ্বাস ছাড়তে পারছেন, হ্যাঁ ছাড়তে পারছি। এই তো আপনার অধিকার একদম সুরক্ষিত। তেমনটা হবে না। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, আমি কি পরিবেশে আছি। আমার জীবনের অধিকারের জন্য এ রুমে সুস্থ পরিবেশ দরকার। আমার অধিকারের জন্য খাবার দরকার, এই সব কিছুই তো আমার রাইট টু লাইফের সাথে জড়িত। এই যে ব্যাপারটা, এই ব্যাপারটা কিন্তু ১৯৯৭ সালে মহিউদ্দিন ফারুকের যে মামলা করা হয়েছে, সে অসাধারণ মামলাতে কোর্ট বলে দিয়েছে। সেখান থেকে কিন্তু অনেক অনেক এক্সটেনশন হয়েছে। এই মামলার মূল কথাটি হচ্ছে, শুধু শারীরিকভাবে বেঁচে থাকলে রাইট টু লাইফ নিশ্চিত হবে না। রাইট টু লাইফের জন্য জীবন যাপনের জন্য অনেক কিছুর দরকার হয়। পরিবেশ, খাবার দাবার। আপনি ভেজালযুক্ত খাবার খাচ্ছেন আপনার রাইট টু লাইফ চলে যাচ্ছে। আপনি সংবিধানের আলোকে মামলা করেন। ভেজাল আইনে যাওয়ার আগে আমার রাইট টু লাইফ তো লঙ্ঘিত হচ্ছে। কয়েকবছর আগে আপনাদের মনে আছে, বাচ্চাদের দুধে মেলামাইন পাওয়া গিয়েছিলো একটা মামলা হয়েছিলো। ঠিক রাইট টু লাইফের ভিত্তিতেই কিন্তু তারা গিয়েছিলো। প্যারসিটামল সিরাপ নিয়ে বহু বছর আগে একটা মামলা হয়েছিলো। সেটাও কিন্তু রাইট টু লাইফকে কেন্দ্র করে। এই গেল আমাদের সংবিধানের জায়গা।

দ্বিতীয় যে আইনটি আলোচনা করছি, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন(বিএসটিআই) অ্যাক্ট। অনেক বড় একটা নাম। এটা আসলে বিএসটিআই, এখানে সব পরীক্ষা করে। ওই আইনের কথা বলবো। আমি শুধু অসঙ্গতির জায়গাগুলো তুলে ধরছি বা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, কোথায় আমরা একত্রিতভাবে একটা মুভমেন্ট করতে পারি। যেমন বিএসটিআই আইনের ৬ ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা আছে, বিএসটিআই শুধু ডিল করে কমোডিটি আর প্রডাক্ট নিয়ে। তাহলে প্রশ্ন আসছে, জ্বালানি কি প্রডাক্ট, কমোডিটি? এটা কি পণ্য? না এটা সার্ভিস? এই প্রশ্নটাকে কিন্তু আমাদের সমাধান করতে হবে। কেন সমাধান করতে হবে? আমরা বিএসটিআই আইনের অধীনে যখনই প্রশ্ন করার চেষ্টা করবো, তখনই কিন্তু আমাদের এ জায়গা বুঝতে হবে, যে আমি কমোডিটি নাকি তার সার্ভিস প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাচ্ছি? এটা একটা বিশাল প্রশ্ন যে, জ্বালানি কি কেবলই পণ্য হিসেবে গণ্য হবে? এটা কি সার্ভিসের মধ্যে পড়বে না? এখন যদি আপনি কয়লার কথা বলেন, এটা কমোডিটি, হাত দিয়ে ধরা যায়। কিন্তু বিদ্যুৎ? এটা কি সার্ভিস? তো এখানটাতে অনেকগুলো মামলা আছে, যেখানে আমাদের জন্য অনেকেই অনেক কাজ করে দিয়ে গেছে। যেমন আমেরিকায় নিউইয়র্ক, কেনটাকি, মেরিল্যান্ড, মিশিগান, এইসব স্টেটে অনেকগুলো কোর্টে অসংখ্য মামলাতে আমেরিকার কোর্ট বলে দিয়েছে ইলেকট্রিসিটি শুধু প্রডাক্ট নয় এটা একটা সার্ভিসও। আপনারা যদি পূর্ণ পেপারটা রেফারেন্স হিসেবে পড়তে ইচ্ছা করে ক্যাবের লাইব্রেরিতে নিশ্চয়ই সেটা থাকবে। সেটা আপনার পড়ে দেখবেন, সেখানে সব কেইসগুলো রেফার করা আছে।

তাহলে ইলেকট্রিসিটি যদি সার্ভিস হয় প্রডাক্ট না হয়ে, বা বিএসটিআই যদি বলে না না এগুলো আমাদের কাছে আনবেন না। এগুলো আমাদের দেখার বিষয় না। এটা আমাদের আইনে নাই। তাহলে বিএসটিআইয়ের আইনে মজার মজার কতগুলো সেকশন আছে। যেমন দেখছেন, ৬(ক) ধারায় বলা আছে, Consumers can claim that energy production and energy service practices are very much within the functional ambit of the BSTI.

অর্থাৎ তারা বলছে, আমরা প্রডাক্ট তো দেখবই দেখবো। এমনকি যেকোনো জিনিসের প্রডাকশন বা সার্ভিস প্রাক্টিসেসও আমরা দেখবো। তো প্রডাকশন দেখতে গেলেই তো জ্বালানি চলে আসবে। সার্ভিস প্রাক্টিস দেখতে গেলেই তো জ্বালানি চলে আসে। তাহলে সিক্স-এ-এর অধীনে আমরা ঢুকাতে পারছি এনার্জি সার্ভিসকে তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ঠিক একইরকমভাবে বলছে, যেকোনো ইন্ডাস্ট্রিকে আমরা দেখতে পারি, স্ট্যান্ডার্ডাইজ করতে পারি। জ্বালানি ইন্ডাস্ট্রি তো আর মঙ্গলগ্রহ থেকে আসেনি। এটা তো আমাদের এইখানেই তৈরি হচ্ছে, সুতরাং সেটাও কিন্তু তারা দেখতে বাধ্য। তারা যদি বলে আমরা শুধু কমোডিটি দেখব, তাহলে আমরা কিন্তু এই ধারার আলোকে তাদের সঙ্গে একটা দর কষাকষিতে যেতে পারি।

৬(গ) তে বলছে, আমরা শুধু প্রডাকশন ও ডিস্ট্রিবিউশনই দেখব না, যেকোনো ইন্ডাস্ট্রির যারা প্রডিউসার ও ডিস্ট্রিবিউটর রয়েছে তাদের কার্যকর্মকেও আমরা স্ট্যান্ডার্ডাইজ করতে পারি। তাহলে জ্বালানি সেক্টরকে বাদ দিচ্ছে কিভাবে? বাদ দেওয়া হয়নি। সুতরাং বিএসটিআইয়ের আইনে কোনো সীমাবদ্ধতা নাই জ্বালানি সেক্টরের সার্ভিস অথবা প্রডাক্টের উপর। প্রডাক্ট তো তারা দেখতে বাধ্য, সার্ভিসও যদি হয়, সেটাও তারা দেখতে বাধ্য। বিদ্যুতের মান কেমন, সেবা কেমন দিচ্ছে, তার জন্য আমার অন্য প্রডাক্ট নষ্ট হচ্ছে বা হতে পারে, এরকম সবকিছু কিন্তু আমরা বিএসটিআইয়ের কাছে নিয়ে যেতে পারি। বলতে পারি, আপনারা এখান থেকে নির্দেশনা দিতে পারেন। সেখান থেকে বলছি, আমরা কিন্তু আসলেই বিএসটিআইকে প্রো একটিভ রোল প্লে করতে দেখি না। মানে খুব উঠে পড়ে লেগে কাজ করবে, তা না। ওই ধামাধরা কিছু কাজ করে যায়। বিদেশ থেকে আসছে কিছু প্রডাক্ট, দেশে কিছু প্রডাক্ট হচ্ছে, মাঝে মাঝে ম্যাজিস্ট্রেট নামাচ্ছে। এই মিষ্টিতে চিনি ঠিক আছে কিনা, দুধ ফেটে যাচ্ছে কিনা। এগুলো যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু না মানে এগুলো যে খারাপ তা বলছি না। কিন্তু জ্বালানি সেক্টর যে বিএসটিআই দেখতে পারে সে ধরনের একটা দাবি আমরা যৌক্তিতভাবে তাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারি। তবে এখানে একটা সুখের কথা হচ্ছে বিএসটিআইয়ের একটা কাউন্সিল আছে যে কাউন্সিল সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে কাউন্সিলের কিন্তু সদস্য হচ্ছে, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ক্যাব। সুতরাং ক্যাব যদি সেখানটাতে মেম্বার থাকে আমরা আমাদের আন্দোলনটা কিন্তু ক্যাবের মাধ্যমে সেখানে উপস্থাপন করতে পারি অথবা যৌক্তিকভাবে তা প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

এবার আমরা দেখব বিদ্যুৎ আইন। এটা নতুন আইন, ২০১৮ তে করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে সিভিল ওয়ার্কস কাকে বলে অর্থাৎ বিদ্যুতের লাইন টানার কাজ কিভাবে হবে।

লাইসেন্স দেওয়া হয় যে তোমরা ওখানে কানেকশন দাও। তারা কিন্তু বিভিন্নভাবে আমাদের দুর্ভোগে ফেলে। একটা লাইন হবে, তো মাটি খুঁড়ছে তো খুঁড়ছে তো খুঁড়ছে। কতদিনে এটা শেষ হবে, বলে বলতে পারি না। কনট্রাক্টর নাই, লাইন বাঁকা, ঈদের পরে হবে। ঈদের পর বলে ছুটিতে গিয়ে লোক আর আসে নাই। আসলেও কাজ হতে দেরি হচ্ছে। এই যে আমরা সাফার করছি, কনজুমাররা সাফার করছে, সেটা কি কারণে করছে। আমার ইলেকট্রিসিটি পাওয়ার জন্যই তো এগুলো সহ্য করছি। এখন ইলেকট্রিসিটি আইনে বলা আছে এই যারা সিভিল ওয়ার্কস করবে, খুঁড়বে, কনস্ট্রাকশন করবে, তাদের লাইসেন্স দেয়ার শর্তে বলা আছে, তুমি একদম কম ভোগান্তিতে যত তাড়াতাড়ি পারো কাজটা শেষ করবে এবং শুধু তাই না, তুমি সেখানটাতে যথেষ্ট পরিমাণ নোটিশও দেবে। নোটিশ ছাড়াও করতে পারো যদি ইমারজেন্সি সিচুয়েশন হয়। তবে ইমারজেন্সি কিন্তু রেগুলার হবে না। ইমারজেন্সি হচ্ছে ব্যতিক্রম। কিন্তু আমরা দেখি এটা হয় না। আমরা দেখি এ সমস্ত কাজ করতে গিয়ে আমাদেরকে অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়। আমি এখনো ইলেকট্রিসিটির লাইন পাইনি, আমি ইলেকট্রিসিটি কনজ্যুম করছি না, তখন ইলেকট্রিসিটি অথরিটি বোঝানোর চেষ্টা করে আপনি তো ভাই কনজ্যুমার না। আমরা আপনার সাথে কেন এত কথা বলতে যাবো। কথা বলার জায়গটা হলো, আপনার লাইসেন্সে যে শর্ত আছে, রেগুলেশন আছে, সেখানে বলা হচ্ছে এ ধরনের ভোগান্তি দেয়া যাবে না। এরপরেও সে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যেকোনো সময়ে ইলেকট্রিসিটি নিয়ে আমরা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হই, সেগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষতিপূরণ দাবি করার জায়গা রয়েছে। কিন্তু দেখা যায় এই ক্ষতিপূরণ দাবির দিকে কেউ যায় না। তারাও চিন্তিত না যে এটা দিতে হবে, আমরাও সেটা করছি না যে এটা আদায় করতে হবে। বিদ্যুৎ আইনের অধীনে যদি কোনো সাংঘর্ষিক জায়গা হয় তাহলে কিন্তু আমাদের এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের কাছে যেতে হবে সেই বিবাদ সমাধানের জন্য। কিন্তু হায়রে আমার বিইআরসি! কিন্তু তারাও তো সে ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপই নেয় না। আমাদের এখন যেটা দরকার, তা হলো ইলেকট্রিসিটি রাইট অব কনজুমার রুলস একটা বানাতে হবে। যেটা নাকি আমাদের প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারতে রয়েছে। এটা বনানো হলে তাতে আমাদের অনেক সুবিধা হবে।

আমরা এরপরে চলে যাচ্ছি, বাংলাদেশ পরিবেশ সুরক্ষা আইনে। এর মানেই হচ্ছে আমাদের পরিবেশকে সুরক্ষিত করার জন্য ১৯৯৫ সালে এ আইনটা করা হয়েছে। এখানে আমরা যেটা দেখতে চাই, জ্বালানির সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্কটা। এই রিলেশনটা খুব গভীর। পরিবেশ সংরক্ষণ করার মধ্য দিয়ে এনার্জি জাস্টিস নিশ্চিত করা যায়। সেটা আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি। আমি সেজন্য এখানটাতে সেই ডিটেইলসে আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি না। এখানে যেটা দেখার বিষয়, আমাদের একটা পরিবেশ অধিদপ্তর রয়েছে। যে নাকি কনজুমারদের এ অধিকারগুলো দেখার ব্যাপারে কাজ করবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, তারা খুব একটা এক্টিভ রোল প্লে করছে না। সুতরাং এ আইনের অধীনেও কিন্তু আমরা কাজ করে যেতে পারি। যেহেতু কনজুমারস রাইট প্রটেকশন আইন নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। তো এখানে আমি খুব সংক্ষিপ্ত করে বলে যাবো। কনজুমার রাইটস প্রটেকশন আইন ২০০৯

তে জ্বালানির সংজ্ঞাটাকে খুব সীমিত আকারে করা হয়েছে। সার্ভিস বলতে শুধু ফুয়েল, গ্যাস আর ইলেকট্রিসিটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর বাইরেও যে নতুন নতুন জ্বালানি রয়েছে রিনিউয়েবল এনার্জির মতো, সেটার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জায়গাটা এখানে উল্লেখ নেই। এখানেও কিন্তু সংকট সমাধানের জন্য একটা কাউন্সিল আছে, সেখানে ক্যাবের প্রতিনিধিত্ব আছে। সুতরাং আমাদের যা কিছু বলার ভোক্তাদের কণ্ঠ হিসেবে ক্যাব সেখানে উপস্থিত হয়ে আমাদের কথাগুলো বলতে পারে। এখানে আরেকটি বিষয় হলো, আমাদের কনজুমারের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার। সেটি কিন্তু এ আইনে খুব সীমিত করা হয়েছে। প্রথমত হলো ক্ষতিগ্রস্ত হলে আপনি কিন্তু একা গিয়ে মামলা করতে পারছেন না। আপনাকে গিয়ে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে আবেদনপত্র দিতে হবে। মানে আপনার ১০ টাকার মিষ্টি খাওয়ার পর পেট খারাপ হলে যাবেন মহাপরিচালকের কাছে। পকেটের টাকা খরচ করে পৌঁছাবেন। সেখানে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করবেন। সময় খরচ করবেন। এরপর তারা এরকম হাজার দুয়েক অভিযোগ পেলে সেখান থেকে ৫০টি নিষ্পত্তির চেষ্টা করবে। আপনি খুব ভাগ্যবান হলে আপনারটাও তুললো। তারপর নানা কাঠখড় পুড়িয়ে দেখা গেল যে, জরিমানা করল এবং যা জরিমানা হবে আপনি পাবেন তার ২৫ শতাংশ। এখানে একটা প্রশ্ন আছে, আপনার যে ক্ষতি হচ্ছে, সেটা যদি হয় এক লাখ টাকার, আর ক্ষতিপূরণ আসলো ১০০ টাকা। আপনি পাবেন ২৫ টাকা। তাহলে এটা কি ধরণের আইন? এই আইনের ভেতর অসঙ্গতি আছে না? আমার যদি ১০ টাকা ক্ষতি হয় ২৫ টাকা পাই তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমার ক্ষতির পরিমাণটা বেশি। আপনি চিন্তা করেন, আপনি ১০ টাকার মিষ্টি কিনে খেলেন, আপনার ওষুধ কিনতে হচ্ছে, আপনার হসপিটালে যেতে হচ্ছে, সময় যাচ্ছে, অফিস মিস হচ্ছে, বেতন কাটা যাচ্ছে, এসব কিছু মিলিয়ে আপনার ক্ষতিটা অনেক বেশি। তারপর আপনি ২৫ টাকা পেলেন। তাতে কি আপনার যথেষ্ট হল কিনা? সেজন্য অনেক মানুষ চিন্তা করে ধুর, যাওয়ার দরকার নেই। যা হয়েছে আমার কপাল খারাপ, সবার কপাল ভালো, আমার কপাল খারাপ, ফাটা কপাল নিয়ে এসেছি, বাদ দিলাম। এভাবে ভোক্তা আন্দোলনকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। আর সরাসরি কোর্টে যাওয়ার অধিকার ভোক্তা অধিকার আইনে নেই। আপনি এমনিতে যেতে পারেন, যে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সেটাও লম্বা একটা ব্যাপার।

এবার একটা গুরুত্বপূর্ণ আইনের বিষয়ে বলছি; প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বলা হয়েছে বাজার যাতে একচেটিয়া না থাকে। একচেটিয়া হলে যা হয়, যেমন লবণের বাজার একচেটিয়া বাজার। আমি যদি বলি ১ কেজি লবণের দাম ১০০০ টাকা আপনাকে সেই দামেই কিনতে হবে। আপনার কোনো উপায় নেই, কারণ লবণ না খেয়ে থাকা যায় না। কাঁচামরিচ বেগুন নিয়ে অনেক আর্গুমেন্ট হয়েছে। এগুলো পাশের দেশে খাচ্ছে না, এগুলো বন্ধ করেই রাখা যায়। কিন্তু কিছু পণ্য আছে যেগুলো মনোপলি থাকে, মনোপলি শুধু প্রডাক্টের ক্ষেত্রে হয় না, সার্ভিসের ক্ষেত্রেও তা হয়। যেখানে মনোপলি সার্ভিস আছে, যেমন রেলওয়ে। টিকেট নেই কি করবেন, সকাল ৯টার ট্রেন ছাড়ে রাত ৯টায়। কি করবেন কিছু করার নেই। আপনি ক্ষতিপূরণ চাইবেন, কাজ মিস হয়ে গেল। সব কিছু মিলিয়ে আমাদের কম্পিটিশন আইনটি

২০১২ সালে নতুন করে করা হয়েছে। এর মধ্যে কতগুলো দূরদর্শী পলিসি রাখা হয়েছে, বাজারকে আরও বেশি প্রতিযোগিতামূলক করার উদ্দেশ্যে। বাজারকে প্রতিযোগিতামূলক করার মাধ্যমে আপনি সঠিক দাম, ন্যায্য দাম পাচ্ছেন। তবে পারফেক্ট প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে সত্যিকার অর্থে কিছু থাকে না। তবে এখানে আপনি দেখবেন অনেকগুলো বিক্রেতা থাকে, ফলে আপনি দরদাম করে পণ্য কিনতে পারবেন। আপনি এয়ারলাইন্সে দেখবেন দাম যখন কমায়, তখন সব একসাথে কমায়, আবার বাড়ার ক্ষেত্রে এক সাথে বাড়াচ্ছে। এগুলো দেখা যায় একচেটিয়া বাজারের মতো, কারণ কিছু বিক্রেতা দেখেই আমরা খুব খুশি থাকব। কারণ ওরাও আবার একটা সিন্ডিকেট বানাতে পারে। এই সিন্ডিকেটের কারণে আপনি ভাংতে পারবেন না তাদের কাজ। এয়ারলাইন্সগুলো দাম কমাচ্ছে আমরা সবাই খুশি হচ্ছি কিন্তু দাম বাড়ানোর সময় সবাই মিলে বাড়াচ্ছে, কারো খরচ বাড়েনি, একজন বাড়িয়েছে দেখে আমিও বাড়াচ্ছি। তাহলে এটা সত্যিকার অর্থে কি একচেটিয়া বাজার। ঈদের সময় ইতোমধ্যে দাম বেড়ে গেছে। কিন্তু বাসের টিকেট, লঞ্চের টিকেটের দাম বেড়ে গেছে। তেলের দাম কি বেড়েছে? তারা বাস কি আকাশ দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে? আপনি ৫০০ টাকার টিকেট ২,০০০ টাকা দাম, তাও পাবেন না টিকেট। এটা হচ্ছে সিন্ডিকেট।

এই কম্পিটিশন আইনটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন এই সিন্ডিকেট থেকে ভোক্তারা মুক্ত হয়। এটাই এই আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এনার্জির ক্ষেত্রে দেখব এটা গুরুত্বপূর্ণ। যদিও কম্পিটিশন আইন ২০১২ তে ভোক্তার সুরক্ষা নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান নেই। কিন্তু এই আইনে বলা আছে কম্পিটিশন যে কাউন্সিল আছে, তারা যেকোনো সময় যেকোনো জায়গায় বাজারে কম্পিটিশন এনশিওর করবে। কিন্তু তারা যদি তা না করে তাহলে আমরা কি করতে পারি। আমরা আন্দোলন করতে পারি। আমরা একা কিছু করতে পারব না। কিন্তু একসাথে আন্দোলন করতে পারি। একসাথে কাজ করতে পারি। আমাদের তা করতে হবে। আমরা তা না করে, কিছু করার নাই বলে এই দুঃখ পেলে চলবে না। আমরা কিন্তু ভুক্তভোগী অনেক, আমরা দাঁড়াই না, কনজুমারস এসোসিয়েশন এর কাছে এ অভিযোগ দিচ্ছি না।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশ কম্পিটিশন কমিশন, না তারা একটিভ, না আমাদের এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন একটিভ কনজুমারদের নিয়ে। তারা আবার নিজেরাও আলোচনা করে না। অথচ দুই আইনেই বলা আছে, তারা একে অপরের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। কিন্তু এই দুই কমিশনের জানি না কি এতো কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে যে ভোক্তা ইস্যু তাদের কাছে কোনো ব্যাপারই না যে, একটু ভুগুক তাতে অসুবিধা কি। সবাই তো ভুগতেছে, কিন্তু ভুগতে ভুগতে সবার অভ্যাস হয়ে গেছে আরকি। কিন্তু এরা তাদের কাজটা ঠিকমতো করতে পারছে না।

সাসটেইনেবল রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি একটা অ্যাক্ট আছে। রিনিউয়েবল এনার্জি মার্কেটে অনেকগুলো অসামঞ্জস্যতা দেখা যাচ্ছে, আমরা দেখতে পাই সেখানে রিনিউয়েবল এনার্জি নিয়ে যে ধরনের পদক্ষেপ কাজ করার উচিত সেগুলো কিন্তু হচ্ছে না। আমরা কিন্তু করোনা পরবর্তী সময় দেখেছি এনার্জি সংকট কাকে বলে। রাশিয়া-

ইউক্রেন যুদ্ধে এনার্জি সংকট হচ্ছে। আমরা যদি রিনিউয়েবল এনার্জি সেক্টরে মুভ না করি, আমরা কিন্তু ট্র্যাডিশনাল এনার্জি নিয়ে বেশি দূর এগোতে পারব না। সব কিছুর একটা সীমা আছে, তেল কয়লা, গ্যাসের উপর অনেক চাপ পড়ছে। আমাদের দেশে সূর্যের রোদ আছে, পানির প্রবাহ, বাতাস, এগুলোকে নিয়ে হাইড্রো ইলেক্ট্রিসিটি, সোলার এনার্জি বিভিন্ন রকমের ভোক্তাবান্ধব কিছু পদ্ধতিতে যদি আমরা না যাই, যেহেতু আমাদের একটা অথরিটি আছে তারা কিন্তু এই কাজগুলো ঠিকমতো করতে পারে। তবে সেগুলো আমরা হতে দেখি না। এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন এর কথা প্রত্যেকটা আইনের সাথে আমরা ঘুরে ফিরে অনেকবার বলেছি।

আমরা আসলে একটিভ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন দেখতে চাই। এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন যে দাম নির্ধারণ করে সেই প্রাইস মানে না লাইসেন্সিরা। এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন কিছু তো করবে, তারা বলে আমরা কি করব। আপনারা কথা বলেন। আমরা কথা বলব কেন। তার জন্য তো অথরিটি আছেন আপনারা। আপনি তাদের লাইসেন্স বাতিল করেন। এছাড়া কনজুমার ডিসপিউট রিসল্ভ করার দায়িত্ব কিন্তু তাদের আছে। কিন্তু এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আজ পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেছে কিনা সন্দেহ আছে। তাদের অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার ক্ষমতাও আছে কাজ বন্ধ করে দেওয়ার। যেমন নাকি সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন করেছে, প্রাইস আপডাউন করছে, এদের ট্রেডিং বন্ধ করে দেও, সার্কিট ব্রেকার ফেলে দিচ্ছে। ঠিক একই রকম ক্ষমতা এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের আছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা হয়েছে কি না সেটা আমরা জানি না। এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের আইনের সীমাবদ্ধতার জায়গা যেমন রয়েছে, আবার সীমাবদ্ধ আইনের ভেতরে কমিশন যা করতে পারে তাও করছে না। আমাদের কপাল এতো খারাপ কি বলব আর বলেন! আইনের নামে আইন আছে, কিন্তু সেই প্রয়োগটা সেরকম হচ্ছে না। এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনকে অনেকটা পেপার টাইগার হিসেবে বানিয়ে রেখেছে। দেখতে বাঘের মতো কিন্তু না আঁচড়াতে পারে, না কামড়াতে পারে। এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের কোনো অধিকারই নেই এনার্জি পলিসি বানাবার। ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে সরকার তার সাথে আলাপ করবে না। তাহলে আমার কমিশন কিভাবে শক্তিশালী হবে? কি করে তাদের মধ্যে আরও শক্তি আসবে? এগুলো না হয়ে যদি ধামাধরা একটা কমিশন বসে থাকে, সেখানে কয়েকটা শুনানি হয়। প্রাইস নিয়ে শুনানি হয়, সেখানে একটা লোক দেখানোর মতো শুনানি হয়, একটা লম্বা সময় আমিও কাজ করেছি। অধ্যাপক শামসুল আলম স্যারের অনেক ধৈর্য্য স্যার এখনো কাজ করেন। কথা বলেন ভোক্তাদের হয়ে ওখানে গিয়ে। আমরা বলে চলে আসি, তারপর যা হওয়ার তাই হয়। তারপরেও আমরা একটা ভয়েস রাখছি। আমরা ছেড়ে দিচ্ছি না। আমাদের এখানে একটা একটিভ একটা রোল প্লে করতে হবে।

আমাদের কিছু জায়গায় আইনি পরিবর্তন দরকার। সেগুলোর জন্য আমাদেরকে কাজ করতে হবে। কিছু জায়গায় আইন আছে প্রয়োগ নেই। তাহলে প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। কিছু জায়গায় আমাদের মার্কেট রেগুলেটররা, তারা প্রো একটিভ রোল প্লে করছে না, তাদেরকে বাধ্য করাতে হবে। আপনার অধিকার আছে আপনি বাধ্য করেন। এনার্জি

মার্কেটের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর যে চেষ্টা, তা খুব সীমিত। এখানে নেসেসারি কনজুমার মুভমেন্টকে ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে। এবং শুধু করলাম, একদিন একটা প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়ালাম তা না, এটার পেছনে লেগে থাকতে হবে। এবং সেটাকে একটা দেশব্যাপী আন্দোলনে নিয়ে যেতে হবে। এগুলো আমাদের খুব সাধারণ কনক্লুশন। আমি আলোচনার চূড়ান্ত উপসংহার টানা পছন্দ করি না। এখানে আপনাদেরও অনেক আইডিয়া থাকতে পারে। তাই এই আলোচনাটা উন্মুক্ত রাখতে চাই যাতে আপনারা চিন্তা করতে পারেন।

সকলকে ধন্যবাদ।

প্রবন্ধ উপস্থাপন
ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া

প্রবন্ধের শিরোনামঃ To protect Consumers Energy Right Ensuring Energy Justice: CAB Experience

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। প্রথম বক্তা যিনি বললেন, আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সরোয়ার ভাই, তার উপস্থাপনাটা এতটাই তথ্যবহুল এবং চমৎকারভাবে আইন ও পলিসির যায়গাগুলো এতো পরিষ্কার করে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে আমি নিজেই অবাক হয়েছি, ওনার এনালিটিকাল পাওয়ার দেখে। পরবর্তীতে আইনের বিষয়গুলো নিয়ে ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ আপা যেভাবে পরিষ্কার করলেন আপনাদেরকে, এতোটাই ইনফরমেটিভ ও বিস্তারিতভাবে তিনি জায়গাগুলোকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন, এর পরে আসলে আমার আইনজীবী হিসেবে আইনের লড়াইয়ের কথা খুব বেশি বলার আছে, তা কিন্তু নয়।

আমি আপনাদের বোঝার জন্য সহজ করে বলার চেষ্টা করছি। কিন্তু এনার্জি সেক্টরের এই টেকনিকাল আলাপগুলো আমিও অত ভালো বুঝি না। তাহলে আদালতে কিভাবে উপস্থাপন করব? আমি নিজেই যদি না বুঝি, কোর্টকেও তো বোঝাতে হবে, কোর্টও তো নতুন কথা শুনছে। বিচারক মহোদয় যে ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে গেছেন তাও কিন্তু না। ওনারও কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড 'ল'। তাহলে তার কাছ থেকে আমি অর্ডার পাব কিভাবে? সেটা গ্যাস হোক, এলএনজি, এলপিজি যেকোনো বিষয় নিয়ে হোক না কেন। এই কোর্ট থেকে যদি আমাদের অর্ডারটা পেতে হয়, তাহলে কোর্টকে এই কনফিডেন্স দিতে হবে যে আমি যা বলছি আপনি কিন্তু তা বোঝেন। আমি যদি উল্টোটা দেই, আমি যদি কোর্টকে এরকম একটা ভাইব দেই যে আমি যা বলেছি তা আপনার মাথার ওপর দিয়ে যাবে, আপনি এতো টেকনিক্যাল আলাপ বুঝবেন না। তাহলে উনি আমাকে অর্ডার দিবেন না। বলবেন যে আমি যদি নাই বুঝি তাহলে তোমাকে অর্ডার দেব কেন? তুমি আমাকে ভুল বুঝিয়ে উল্টা পাল্টা অর্ডার নিয়ে যাবে। তাহলে বিচারক তো এটা বোঝেন যে কোন জায়গায় উন্নয়ন হচ্ছে, কোন জায়গায় ন্যায্যতা হচ্ছে না বা কোন জায়গায় ভোক্তার অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে, আইনে কি আছে, আর হচ্ছেটা কি; এই দিকগুলো আমি ব্যাখ্যা করব।

ক্যাবের যত টেকনিকাল কাজ, ক্যাবের টেকনিকাল টিমগুলো, গবেষণায় যারা জড়িত আছেন যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিভিন্ন গবেষণায়, সেই গবেষণালব্ধ অনেক টেকনিকাল ডেটা যেগুলো আমার পক্ষেও অনেক সময় বোঝা সম্ভব হয় না। সেই জায়গায় আমার ট্রান্সফরমেশনটা তৈরি হয় যে, এটা তাহলে নাগরিকের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জায়গা থেকে আমি আদালতকে কিভাবে বোঝাতে পারি, সেখানে গিয়ে কিভাবে আদেশ নিয়ে আসতে পারি। যেটা বাস্তবে আমার আপনার কনজুমার রাইটকে সুসঙ্গত করবে এবং এনার্জির ওপর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে আমি আদালতের মাধ্যমে কিছুটা স্বীকৃতি আদায় করে নিয়ে আসতে পারব, সেই বিষয়গুলো আমিও শিখছি।

আদালতের মাধ্যমে স্বীকৃতি আদায়ের প্রশ্ন আসছে কেন? আমার পূর্ববর্তী বক্তার (তুরিন আফরোজ) বক্তব্য শুনে মনে হতে পারে যে, সংবিধানে তো আমাদের অনেক কথা বলা আছে। এছাড়া উনি বেশ কিছু আইনের কথা বললেন, সেগুলো যদি থাকে, সেগুলো যদি ঠিকমত প্র্যাকটিস হয়, তাহলে তো আমাদের অধিকারের স্বীকৃতি থাকার কথা। অধিকার এমনিতেই সুসঙ্গত হওয়ার কথা। তাহলে আবার আদালতের মাধ্যমে স্বীকৃতি আদায়ের প্রশ্ন আসছে কেন? আপনারা খেয়াল করেছেন হয়তো, তিনি বলেছিলেন সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিছু মূলনীতি আছে, সেই মূলনীতিগুলো আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য নয় অর্থাৎ রাষ্ট্র যদি এসমস্ত মূলনীতি লঙ্ঘন করে থাকে তাহলে সেগুলো আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হবে না। তিনি আবার এও দেখিয়েছেন, দুই তিনটি মামলাতে ১৯৯৬ থেকে শুরু করে ২০১০ ও ২০১১ সালের কিছু মামলার উদাহরণ দিয়েছেন যে, উচ্চ আদালত এই পলিসির ক্ষেত্রেও ইন্টারফেয়ার করছে। এই ইন্টারফেয়ার করার ক্ষেত্রে আদালতের যুক্তিটা কি? আদালত কি সংবিধানের মূল স্পিরিট, সংবিধান তাকে যে ক্ষমতা দিয়েছে তার বাইরে কি সে যেতে পারে? পারে না। তাহলে এখানে ব্যাখ্যা আসছে এরকম যে, রাষ্ট্র নতুন করে কোনো ধরনের অসমতা তৈরি করতে পারবে না, অসাম্য তৈরি করতে পারবে না। কোনো আইন কিংবা কোনো নীতি দ্বারা বৈষম্য তৈরি করতে পারবে না। উনি যে মামলাগুলোর রেফারেন্স দিয়েছেন তারপরও হাইকোর্টে অনেকগুলো মামলা এসেছে এবং বেশ কয়েকটিতে আমি নিজেই জড়িত ছিলাম। কোর্টের মূল পয়েন্টই হচ্ছে যে, রাষ্ট্র আইন করার নামে, নীতি করার নামে নতুন করে জনগণকে কোনো বৈষম্য করতে পারবে না। অসাম্য তৈরি করতে পারবে না। অসাম্য তৈরি করতে পারবে না কথাগুলো অনেক টেকনিকাল কথা, অসাম্য তৈরি করতে পারবে না মানেটা কি? যেহেতু আমাদের সংবিধানেই বলা আছে যে আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান। অর্থাৎ সমাজে নানান ধরণের অসমতা থাকতে পারে, ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ, অনেক রকমের ভেদাভেদ থাকতে পারে, দক্ষ-অদক্ষ এরকম অনেক কিছু। কিন্তু যখন আইনের কাছে যাচ্ছে, অধিকারের কথা যখন ব্যক্ত করছে, তখন আইনের কাছে কোনো পার্থক্য নেই। ধনী-দরিদ্র, দক্ষ-অদক্ষ এসবের কোনো পার্থক্য নেই, সবাই সমান। তাহলে কোথাও যদি গিয়ে আপনার অধিকারের ব্যত্যয় ঘটে সেখানে সাম্য আনতে আর্টিকেল ২৭ আছে। কিন্তু এই আইনকে আমরা যেমন হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছি আদালতও রায় প্রধানের ক্ষেত্রে তাদের যুক্তির বৈধতা দেওয়ার জন্যে এই আর্টিকেল ২৭ কে ব্যবহার করছে।

যেখানে আমাদের সংবিধানে সমতার মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে।

আমি এটা একটু বলে নিলাম যে কারণে, আমার বাকি আলাপগুলোতে খুব বেশি টেকনিকাল আলাপ নেই। টেকনিকাল আলাপগুলোকে কতটা সহজ করে আদালতের মাধ্যমে স্বীকৃতি আদায় করে নিয়ে আসা যায় যেখানে আইনি ঘাটতি আছে সেই যায়গাটা হচ্ছে আমার আলাপের মূল বিষয়।

কথা হচ্ছে এতোগুলো আইন আছে তবে আইন থাকা সত্ত্বেও আমাদের আইনি সুরক্ষা কিন্তু খুব একটা নেই। বিশেষত এনার্জি জাস্টিস এর ক্ষেত্রে। এনার্জি রাইটের সুরক্ষার কথা সংবিধানে সরাসরি নেই। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে নানাভাবে রাইট টু লাইফকে আশ্রয় করে নানাভাবে আমরা আদালতে এক্সটেন্ডেড ইন্টারপ্রিটেশন করার চেষ্টা করি। অনেক কিছু বাড়িয়ে ওটাকে কাভার করার চেষ্টা করি। অথচ খোলাখুলিভাবে এটা থাকতে পারত, সংবিধানে এটা সংশোধন আনা সম্ভব। সংবিধান সংশোধন এ পর্যন্ত ১৭ বার হয়েছে। আরও ১৭ বার হতেও কোনো সমস্যা নেই। আপনারা জানেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ইতোমধ্যে সাড়ে-চারশোবারের বেশি সংশোধন করা হয়েছে। আমাদের তো মাত্র ১৭ বার সংশোধন হয়েছে। সংবিধানকে আলাদা একটা আইনি বই, কিতাব স্টাইলে চিন্তা না করে আমাদের নিজেদের চুক্তিপত্র হিসেবে দেখা উচিৎ। নাগরিকরা কিভাবে তার দেশে থাকবে, তাদের অধিকারগুলো চর্চা করবে সে চুক্তিপত্র হিসেবে যদি চিন্তা করি তাহলেও সংবিধান সংশোধন প্রয়োজন হতে পারে। যত দিন যাচ্ছে নানা ধরনের চাহিদা তৈরি হচ্ছে, অনেক চাহিদা বাতিল হচ্ছে, সেগুলোকে সংযোজন-বিয়োজন করার সুযোগ আমাদের সংবিধানে আছে।

কথাটা বলছি এজন্য যে, আমাদের ওই মুভমেন্টে যেতে হবে, সুনির্দিষ্ট এনার্জি রাইটের স্বীকৃতি আমাদের সংবিধানে আনতে হবে, যেটা এই মুহূর্তে স্পষ্টভাবে নেই। মূলনীতির মধ্যেই যদি থাকে অথচ মৌলিক অধিকারের মধ্যে যদি না থাকে, তাহলে আমি যথাযথভাবে ওটাকে বলবৎ করার জন্য আদালতের কাছে যেতে পারছি না। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে যেতে হচ্ছে। মামলাগুলোর কয়েকটা উদাহরণ দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন।

এনার্জির মধ্যে দেখবেন যে আমাদের বিইআরসি অর্থাৎ এনার্জি রেগুলেটরি অ্যাক্ট; সেই আইনের মধ্যে মূলত এনার্জি বলতে কি বোঝাবে ধারা ২ এর (খ) তে উল্লেখ করা আছে, সেখানে বলা হচ্ছে, ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস, পেট্রোলিয়াম জাতীয় প্রোডাক্ট। শুধু এই তিনটি বিষয় তারা এনার্জির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে কিন্তু আমরা ক্যাব থেকে যে জিনিসটা প্রচার-প্রমোট করার চেষ্টা করছি, আমাদের ট্রানজিশন পলিসিতে দেখবেন যে সংজ্ঞাটাকে আরেকটু বিস্তারিত জায়গায় নিয়ে যেতে চাচ্ছি। সেখানে আমরা কয়লা, নিউক্লিয়ার এনার্জি, রিনিউয়েবল এনার্জি, বায়োমাস, গ্যাস এ সমস্ত সবগুলো বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাবনা এনেছি। অর্থাৎ বিতর্কটা হচ্ছে আইন যেটা আছে আমরা সেটাতে সন্তুষ্ট না। যেহেতু অনেকগুলো নতুন এনার্জির সোর্স আছে সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। ২০০৩ সালের আইনে সেগুলো তারা বিবেচনা করেননি। ২০২৩ সালে আরও বিশ বছর পর কি আমরা চিন্তা করতে পারব না? আমাদের আইনগত এমন কোনো বাধা নেই যে আমরা এগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারব না। তো এই জায়গাটাও আমাদের আন্দোলনের অংশ। আমরা এই

জায়গাটাকে আপনাদের বলব খেয়াল করার জন্য।

রাইট টু এনার্জি বলতে কি বোঝাব? সেটা আমাদের আইনের মধ্যে, খুব একটা পরিষ্কার করে সংবিধানে বলা নেই। নিরবচ্ছিনভাবে এবং ন্যায্যমূল্যে এনার্জি সরবরাহ নিশ্চিত করবে, সেটাই হচ্ছে রাইট টু এনার্জি। আর এনার্জি জাস্টিসের কথা আমাদের সংবিধান কিংবা কোনো আইনে কি বলা আছে? সেটাও নেই। কিন্তু বিগত এক দশক ধরে সারা বিশ্বে একটি আলোচিত টার্ম এবং নানান প্র্যাকটিস থেকে বিভিন্ন দেশের আলাপ আলোচনা থেকে যে সংজ্ঞাটি এখন পর্যন্ত আমাদের সামনে এসেছে, যেটাকে আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষিত থেকে আলোচনা করছি। সেটা হচ্ছে- এমন একটি লক্ষ্য অর্জন করা যেখানে সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এনার্জি সিস্টেমের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক যে অসামঞ্জস্যগুলো আছে সেগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে নাগরিকের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করাকে বলছি এনার্জি জাস্টিস।

এই যে কতোগুলো টারমিনলজি আমরা ব্যবহার করছি যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, পার্টিসিপেশন, এগুলো অনেক দূরের অপরিচিত শব্দ মনে হলেও কিন্তু ব্যাখ্যা যদি করি তাহলে মনে হবে যে এগুলো আমাদের চোখের সামনেই ঘটছে, আমরা বুঝতে পারছি না। ধরেন আমরা এখানে বসে কথা বলছি, কিন্তু কালকেই মন্ত্রণালয়ে বসে কেউ একজন মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে, ডিজেলের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হবে। আমাদের উৎপাদন যে ব্যয় আছে, পিপিপির অধীনে অর্থাৎ ব্যক্তি মালিকানাধীন যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে বিদ্যুৎ কিংবা অন্য যেকোনো এনার্জি উৎপাদন হচ্ছে সেখানে ওরা বাস্তবে খরচ বহন করে ৫ শতাংশ, বাকিটা জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়। জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া কি? দেশের যে সমস্ত ব্যয় হয় সেটা ন্যাশনাল রেভিনিউর ওপর নির্ভর করছে। ন্যাশনাল রেভিনিউ জেনারেট করছি আমরাই। তার মানে আমাদের জনগণের উপরই চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তো আমাদের জনগণের একটা টাকা কোথায় কিভাবে খরচ করা হবে সেটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার মধ্যে আমাদের কি কোনো অংশগ্রহণ আছে? নেই। আমার এই পার্টিকুলার কথাটার বিরুদ্ধেও একটা বড় রকমের যুক্তি আছে, সেটা হচ্ছে সংবিধানের ৭(২) এর কথা তুরিন আফরোজা আপা বললেন, যে প্রজাতন্ত্রের মালিক হচ্ছে জনগণ। কিন্তু এর পরে আরেকটা লাইন আছে- জনগণ তার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ক্ষমতা চর্চা করবে। এই যে প্রতিনিধির মাধ্যমে ক্ষমতা চর্চা করবে বলছে, এখান থেকে ১৯৭২ সালে আসে জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ। সেই জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশের মধ্য দিয়ে আমরা ৩০০ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করি সংসদে আমাদের এসব আইন প্রণয়ন করার জন্যে। তার মানে এই ৩০০ জন যা করছে আমরা তা করছি। এই ৩০০ জন যে সমস্ত কথা বলে তা আসলে আমরা বলি। আমাদের পক্ষে তারা এই কথাগুলো বলছেন। আসলেই কি তাই? এটা কিতাবি একটা কথা না? আমাদের কি আসলে কোনো নিয়ন্ত্রণ আছে? আমরা যাদেরকে নির্বাচিত করি তারা আমাদের প্রতিনিধি না হয়ে আমাদের মনিব হয়ে যাচ্ছেন। তারা একবার নির্বাচিত হওয়ার পর তাদের উপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ আছে? আমরা এখনো মনে করি এমপি সাহেব আমাদের এলাকায় আসছেন না রাস্তা ঘাট উন্নয়ন করছেন না। এমপি সাহেব তো রাস্তা ঘাট উন্নয়নের জন্য না,

ওটার জন্য মন্ত্রণালয় আছে। উনি গম দেন না, চাল দেন না, এখানে একটা বিল্ডিং বানিয়ে দেন না। এমপি সাহেবের কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন করা, ওনাদের নাম হচ্ছে আইন প্রণেতা। আমরা ওনাদের চাল ডাল দেওয়ার জায়গাটায় চিন্তা করি, রাস্তা বানানোর জায়গাটায় চিন্তা করি। ফলে আমাদের প্রতিনিধিও তৈরি হয় না। প্রতিনিধির কাজটাই হল আমাদের ক্ষমতা চর্চা করার জন্য। আমি ক্ষমতা কিভাবে চর্চা করব? আমার আইনের জায়গাটা দিয়েই তো। আমরা এই ঘরের মধ্যে বসে আছি এখানে কতগুলো আইন আছে, ১৯৫২ সালের বিল্ডিং কন্সট্রাকশন অ্যাক্ট আছে। সেই বিল্ডিং কন্সট্রাকশন অ্যাক্ট অনুযায়ী বিল্ডিং বানাতে হয়নি? কয়টা জানালা হবে কিভাবে বায়ু চলাচল করবে, কয়টা পিলার হবে থেকে শুরু করে সব হিসাবই আছে। লাইটিংটা কিভাবে হবে তার জন্য নানান রকম আইন আছে। এবার ২০০৬ সালের একটি রুলস হয়েছে, কন্সট্রাকশন এর উপর রুলস সেটার আবার নতুন করে গতবছর সংশোধন হয়েছে ২০২২ সালে। শহরের নগর পরিকল্পনা কি হবে সেটা ২০১৬ সালে খসড়া ছিল সেটার পরিবর্তন করে নতুন আইন আসছে ২০২২ সালে। তো এতো কিছু আইন মেনেই কিন্তু আমরা এখানে বসে কথা বলছি আমার শব্দটা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ হবে থেকে শুরু করে। অর্থাৎ আইন তো আমার পিছু ছাড়ছে না। এই আইনটা ধরে নেওয়া হচ্ছে যে আমরা নিজেরাই প্রণয়ন করছি আমাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে। কিন্তু আমাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে আমরা চাল, ডাল, গম, রাস্তা বানানোর মধ্যে চিন্তা করি। ফলে কি হচ্ছে? আমার অংশগ্রহণ কিন্তু সত্যিকার অর্থে নেই। আমরা যদিও মনে করি আমাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আমাদের অংশগ্রহণ হচ্ছে না। এখানেই ক্যাবের নতুন আন্দোলনের জায়গাটা আনতে চাচ্ছি। এখানে আপনাদের নতুন ভাবনা উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছি যে, তাহলে আমাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় কিভাবে। ক্যাবের কুষ্টিয়া থেকে যিনি এখানে এসেছেন কাল যদি ডিজেলের মূল্য বাড়িয়ে দেওয়া হয় তিনি কিভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন। রাজশাহী থেকে যিনি এসেছেন তিনি কি বলবেন, অন্যরা এই বিষয় নিয়ে কিভাবে কাজ করবেন। এই যে অংশগ্রহণের জায়গাটা, অংশগ্রহণ হলে তো আপনি আপনার সুবিধা অসুবিধার কথা ঠিকমতো বলতে পারবেন যে, আপনাদের এনার্জি সিকিউরিটি ফান্ডে এতো টাকা আছে ওটা থাকতে আপনি কিভাবে দাম বাড়াচ্ছেন? আপনি সরকারের কাছ থেকে এত টাকা ভর্তুকি নিচ্ছেন সেটা তো আমাকেই দিতে হবে সেটা তো ব্যয়ের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। আপনি স্পট মার্কেট থেকে কেন এই জিনিসটা আনছেন? এটা তো আপনি ফিক্সড কন্ট্রাক্টে আনলে দাম সস্তা পড়ত। এই কথাগুলো কখন বলবেন কীভাবে বলবেন? এই কথাগুলো বলার মতো কোনো সুযোগ আছে কিনা? এটাই হচ্ছে অংশগ্রহণের বিষয়, এতোগুলো টার্মের মধ্যে আমি শুধু একটাকেই ব্যাখ্যা করছি দেখেন যে আমাদের, অংশগ্রহণ আদতে আছে কিনা? তাহলে নেই তো। এই যে নেই, এটা যখন আপনার উপলব্ধি হবে তখন আমরা পার্টিসিপেশনের জন্য কাজ করব। আমাদের কাছে সব কিছুর জবাব প্রস্তুত নেই। কি কি করলে অংশগ্রহণ হবে সেটা আমরা মুখস্থ বলে দিতে পারব না। এ নিয়েই আমাদের আন্দোলন করতে হবে। এটা নিয়েই আমাদের কথা বার্তা চালিয়ে যেতে হবে। আমরা কিভাবে গেলে অংশগ্রহণ ঠিক করতে পারব, কিসের মাধ্যমে আমরা এনার্জি জাস্টিস নিশ্চিত করতে পারব, সে আলাপ আলোচনা

তোলার জন্য, ভাবনাটা উস্কে দেওয়ার জন্যই আজকের এই কর্মশালা।

আমি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যাচ্ছি না, জাস্টিসের ডাইমেনশনে যে এনার্জি বার্ডেনের কথা বলছি, এনার্জি ইনসিকিউরিটির কথা বলছি, এনার্জি পভার্টির কথা বলছি, এগুলো নতুন আইডিয়া যে এনার্জি দারিদ্র্য আবার কি? আমরা অর্থনৈতিক দারিদ্রের কথা জানি। এনার্জি দারিদ্র্যও আছে, এনার্জি না পাওয়ার মধ্য দিয়ে এটা তৈরি হয়। তুরিন আপার ব্যাখ্যায় কিছুটা এসেছে যে, আমি শহরে বসে যে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি, ইলেকট্রিসিটি পাচ্ছি, গ্রামে একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসে সেটা পাচ্ছি কিনা? আপনারা জানেন সোলার এনার্জি কি কারণে এসেছে? প্রত্যন্ত চরাঞ্চলে সরকারি উদ্যোগে যে সমস্ত বিদ্যুতের সুবিধা দেওয়া হয় সেসবের সার্ভিস কিন্তু ছিল না। সেই জায়গাটাকে পূরণ করার জন্য, যাতে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে মানুষজন বিদ্যুতের সুবিধা পায় তাদের জীবনমান যাতে উন্নত হয় এবং তাদের প্রোডাক্টিভিটি যাতে বাড়ে, সেজন্যই মূলত সোলার এনার্জির কনসেপ্টটা এসেছে। এই সুযোগে কিন্তু রিনিউয়েবল এনার্জির একটা প্রকার আমাদের মধ্যে ঢুকল। ১৭টি সোলার মিনি গ্রিড এনার্জি থেকে আমাদের এখনও উৎপাদন হচ্ছে। বেশ কয়েকটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছে, মাঝখানে বেশ স্ট্রাগল করেছে কিন্তু এখন সরকার তাদের থেকে বিদ্যুৎ কিনছে। আমাদের প্রথম বক্তা সরোয়ার ভাই দেখিয়েছেন সারা বিশ্বে রিনিউয়েবল এনার্জির দাম কমছে, উৎপাদন ব্যয় কমছে। ফলে অনেক কম দামে দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানির দিগন্ত উন্মোচন হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে ঠিক তার উল্টো। আপনি রিনিউয়েবল বিদ্যুৎ কিনতে যাবেন কিন্তু রেগুলার বিদ্যুতের চেয়ে দাম বেশি। যেখানে আপনি ৭/৮ টাকা পিডিবির কাছ থেকে কিনবেন, সেটা রিনিউয়েবল কিনতে দাম পড়ছে ৩০ টাকা। ফলে এই যে অ-জনপ্রিয় করে রাখা এটার মধ্যেও একটি রাজনীতি আছে। আপনি জানেন আমাদের শহর নগরগুলো গড়ে উঠেছে কি কারণে? আমাদের নদীমাতৃক দেশ, নদীকে কেন্দ্র করে। নৌ ব্যবস্থা কি উন্নত হয়েছে বাংলাদেশে? রেল অনেক বেশি কম খরচে অনেক বেশি মানুষকে সার্ভিস দিতে পারে, রেল লাইন কি সম্প্রসারণ হয়েছে? গত ৫২/৫৩ বছরের মধ্যে সেই অর্থে রেলের কি উন্নয়ন হয়েছে? হয়েছে রাস্তা সড়ক। সড়কে বেশ কিছুটা উন্নয়ন হয়েছে। সড়কে কোটি টাকা দামের বাস চলে এখন। কিন্তু সেই রকমের উন্নতি নৌ বা রেল পথে হলো না কেন? এই যে রাজনীতিটা বোঝার ব্যাপার, সেই জায়গাটায় আসছি। রিনিউয়েবল এনার্জিকে যত দিন বলবে এটা খুব ব্যয়বহুল, এটা আসলে অত টেকসই না, এই পলিসিতে যত দিন পর্যন্ত সরকার থাকবে, এটাকে আপনি আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে তুলনা করে বলতে হবে যে অমুক অমুক দেশে তো দাম কমে গেছে আমাদের এখানে বেশি হবে কেন? কমান দাম এখানে। আমাদের যে সোলার মিনি গ্রিডগুলো করছে, তাদের কি সমস্যা আছে? সরকারের এখানে নীতিতে কোথায় ভুল আছে এই আলোচনাতেই আপনাদের আনতে চাচ্ছি। এখন এই আলোচনার দুটো দিক। যেটা অধ্যাপক শামসুল আলম স্যার শুরুর দিকে বলেছিলেন। সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে আন্দোলনের জায়গা, আরেকটা হচ্ছে আদালতের জায়গা। আন্দোলনের জায়গার পাশাপাশি আমরা চলে আসি আদালতে।

সরাসরি না হোক পরোক্ষভাবে ঘুরিয়ে কোনো না কোনোভাবে আমরা এনার্জি জাস্টিসের

কথাগুলো ক্যাবের মাধ্যমে কিভাবে নিয়ে আসতে পেরেছি, সেই জায়গাটায় চলে আসি। আমি কয়েকটা মামলার উদাহরণ দিই। ২০১৮ সালে আমরা একটা মামলা করলাম। ইলেকট্রিসিটির যে ট্যারিফ নির্ধারণের প্রক্রিয়া, সে প্রক্রিয়াটাকে চ্যালেঞ্জ করলাম। বললাম আপনারা ইলেক্ট্রিসিটির মূল্য নির্ধারণের জন্য যে পদ্ধতি অনুসরণ করছেন সেটার মধ্যে নানা ধরনের গলদ আছে। সেখানে আমাদের যে প্রার্থনা ছিল, সেটা স্লাইডে উল্লেখ করা রয়েছে। যার মোদ্দাকথা হলো, ২৩/১১/২০১৭ তে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন দুটি স্মারকের মাধ্যমে ইলেক্ট্রিসিটির মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি করে নির্ধারণ করেছে, সেই বৃদ্ধিটাকে কেন অবৈধ ও অকার্যকর ঘোষণা করা হবে না সেই বিষয়ে জানতে চেয়ে একটা রুল ইস্যু করেন। রুলটা হচ্ছে শোকজ নোটিশ ইস্যু করা হয়। যাদেরকে মামলায় প্রতিপক্ষ করা হয় তাদের প্রতি বলা হয়, আপনারা এর জবাব দেন অন্যথায় ওনাদের যে চাওয়া সেটা আপনাদের অনুপস্থিতিতে আমরা শুনে তাদেরকে রায় দেব, পক্ষে বিপক্ষে যেটাই হোক। আমরা এর পরে চেয়েছিলাম, মূল্য বৃদ্ধির পর্যালোচনায় সেখানে ক্যাবের তরফ থেকে একজন নমিনেটেড মেম্বারসহ ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটা এক্সপার্ট কমিটি গঠন করার কথা বলেছি। ক্যাব থেকে এর মধ্যে কিছু রিকমেন্ডেশন দেওয়া হয়েছে সরকারের কাছে। যেখানে আমরা বলেছি, ক্যাবের তরফ থেকে যে আপনাদের মূল্য বৃদ্ধি করার দরকার নেই। আপনারা নানান ভাবে সিকিউরিটি ফান্ডের মধ্যে টাকা আছে সেখান থেকে সমন্বয় করে কিংবা কস্ট ইফেক্টিভ ওয়েতে যদি আপনারা কস্ট বেসড দামগুলো নির্ধারণের চেষ্টা করেন। এরকম অনেকগুলো সুপারিশমালা ছিল। সেই সুপারিশমালাকে ভালো মতো পর্যবেক্ষণ করে এবং সেগুলো যেন বিবেচনায় আনে সে জন্য একটা এক্সপার্ট কমিটি গঠন করার জন্য আমরা নির্দেশনা চাইলাম। তারপর আমরা বলেছি যে কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সরবরাহের কোম্পানিগুলো তাদের বেতন বৃদ্ধি করতে গিয়ে যে টাকাটা রেভিনিউ বাজেটের মধ্যে ধরা হয়েছে সেটা আবার ট্যারিফের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনি বেতন বৃদ্ধি করতে পারবেন কখন? রাষ্ট্রায়ত্ত বেতন সংক্রান্ত যেসব নীতিমালা আছে সেগুলো অধিকাংশ সময় ওনারা অনুসরণ করেন না। এগুলোকে একেকটা কর্পোরেট বডি বা কোম্পানির মতো করে ধরে নিয়ে যার যার মতো করে ব্যবসাকে একটা পর্যায়ে লাভজনক দেখায়। এবং লাভজনক দেখিয়ে পরবর্তীতে তার দুমাস যেতে না যেতেই বলে আমাদের ব্যবসা তো লোকসানে পড়েছে। আপনারা জেনে অবাক হবেন যে যখন বাজেটের সময় আসে এপ্রিল/মে মাসে সব সময় ইলেক্ট্রিসিটির বিল বাড়ানো হয়। আপনি সারা বছরের বিদ্যুৎ বিলের সাথে এই দুই মাসের বিদ্যুৎ বিল মিলিয়ে দেখবেন যে কোনো কারণ ছাড়াই অতিরিক্ত বিল বাড়াচ্ছে। এই অতিরিক্ত বিল পাঠানোর কারণ হচ্ছে যে ওরা ব্যবসায়ে প্রফিট করছে তা দেখিয়ে বেতনটা বৃদ্ধি বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য। তারপরই যখন হিসাবটা দিচ্ছে হিসাব দেওয়ার সময় দেখবেন ব্যবসা তো আমাদের লসে চলছে। এজন্য আমাদের সাবসিডি বাড়ানো দরকার, দাম বাড়ানো দরকার। তাহলে পরস্পর বিরোধী অবস্থান না এদের? বেতনটাও ট্যারিফ বৃদ্ধির পেছনে একটা বড় রকম ভূমিকা পালন করছে। অর্থাৎ এগুলো তো এক প্রকার দুর্নীতি। এই দুর্নীতি মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাকে আপনাকে হয়রানির

শিকার করছে। আমাদের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। এটা আমি আপনি বললে আমাদের বিরুদ্ধে কিছু কথা আসবে, পাল্টা যুক্তি আসবে সেগুলোকে খণ্ডন করতে, আরেকটা যুক্তি আমরা দেখাব। এখানে খুব একটা হয়ত আমরা ওদের সাথে পেরে উঠবো না। কিন্তু আমরা যদি আদালতের কাছ থেকে একটা স্বীকৃতি নিয়ে আসতে পারি তাহলে সেটা আমরা জোর গলায় বলতে পারব। দেখেন আমাদের যুক্তিটা তো আদালত গ্রহণ করেছে।

একটা বিষয় বলে রাখি, ক্যাব থেকে করা কোনো মামলায় আমরা খালি হাতে ফিরিনি। অধ্যাপক শামসুল আলম স্যার প্রথমেই যেটা আপনাদের বলে নিয়েছেন, আমরা বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা করে অধিকার রক্ষার আলাপ আলোচনা তুলেছি যে আঙ্গিকে, সেগুলো আদালতের মাধ্যমে আমরা আদতে সফল হয়ে আসতে পারছি কিনা। আমি সেই জায়গাটায় উত্তর দিচ্ছি সব মামলাতেই কম বেশি সফলতা পেয়েছি, অসফল হইনি। এটার পেছনে অবশ্যই ক্যাবের কৃতিত্বটা দিতে হবে। কারণ প্রতিটি মামলা করার আগে অন্ততপক্ষে ৫/৬ মাসের গবেষণা এবং আলাপ আলোচনা ও মতামত তৈরি করে নিজেরা অর্থাৎ ক্যাব যতক্ষণ না সন্তুষ্ট হচ্ছে যে এটা নিয়ে যাওয়া যায়, তার আগ পর্যন্ত আমরা যাইনি। শুধুমাত্র গ্যাসের একটি মামলা বোঝার জন্য স্যারের কাছে দুই থেকে আড়াই মাস টানা শিখেছি। বোঝার চেষ্টা করেছি আমি নিজে বুঝে আদৌ যেতে পারব কিনা। স্যার হয়তো ততটা শিওর ছিলেন না যে আমি অতটা বুঝব কিনা, কারণ এগুলা এতো টেকনিকাল টার্ম যে, সহজে বললাম আর বুঝে গেলাম তেমন না।

আমি যেটা শুরুতেও বলেছি এই টেকনিকাল জায়গাগুলোকে আইনের টার্মে ট্রান্সফর্ম করলে আমার অধিকারের যেখানে ব্যত্যয় ঘটছে, আমার ন্যায্যতা যেখানে হারাচ্ছে সেই যায়গাটা আমি বুঝতে পারছি কিনা? আমি যে বুঝে গেছি তা বলবো না, তবে ক্রমাগত শেখার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। প্রতিদিন শিখছি প্রত্যেকের কাছ থেকে শিখছি। আপনাদের কাছ থেকেও শিখতে চাই। অধ্যাপক শামসুল আলম স্যারের কাছ থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত শেখা শেষ হবে না। কিন্তু আমি একটা জিনিস আপনাদের আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে, আমাকে বোঝালে আমি বুঝে কোর্টের কাছে গিয়ে উপস্থাপন করতে পারব। যার প্রমাণ এটাই যে, কোনো মামলায় এখনো খালি হাতে ফিরিনি, অর্থাৎ কোর্টকেও তা বোঝাতে পেরেছি। আমি নিজে বুঝলে তো হবে না।

এইসব মামলাগুলো সব পেন্ডিং মামলা, এখন পর্যন্ত চলছে। গ্যাসের যে মামলার কথা বলেছি, সেখানে গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ নিয়ে আমরা আদালতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা এতো এতো বিষয় এনেছি, অনেক ব্যাপার ঘটেছে এই এক মামলাতে। মামলাটা যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে চারটা বেঞ্চ শুনতে অপারগতা জানিয়েছে। বিব্রতবোধ করেছে যে এই মামলা শুনব না, আপনারা অন্য কোনো কোর্টে যান। সেই মামলাতে আসলে বিইআরসি অ্যাক্টের মধ্যে ছিল বছরে একবারের বেশি গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করা যাবে না। সেটা যদিও ওনারা ২০২০ এ পরিবর্তন করে ফেললেন যে একাধিকবার করতে পারবেন। এই বছর যে এনার্জি রেগুলেটরি অ্যাক্ট পরিবর্তন এনেছে, সেখানে আরও ধ্বংসাত্মক একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে। সেই জায়গাটায় আমি পরে যাচ্ছি। ২০২৩ এর সংশোধনী নিয়ে তার আগে একটু বলে

যাই। যখন ২০২০ এর সংশোধনী আসেনি, হয়ত আমি না বললেও আপনারা বুঝে নিচ্ছেন, সংশোধনীগুলের পেছনেও আসলে ক্যাব দায়ী। এজন্যে যে, আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এতটাই স্ট্রং একটা পজিশন ক্যাব নিয়েছে, আইনের যে ধারাগুলোকে শক্তি হিসেবে ব্যবহার করছিল ক্যাব, সেগুলোকেই সরকার পরিবর্তন করেছে পরবর্তীতে। এখানে ক্যাবের পরিবার হিসেবে আরও বেশি ভয়েস রেইজ করা দরকার। আমাদের প্রতিবন্ধকতাগুলো তৈরি হয়েছে ২০২০ সালের ও ২০২৩ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে। সেগুলো আমরা কিভাবে ওভারকাম করব, সেই আলোচনাটাও আমাদের নিয়ে আসতে হবে। যাই হোক, ওই মামলায় আমরা প্রশ্ন তুলেছিলাম ২ শতাংশ করে তিতাসের জন্য যে সিস্টেম লসের বেনিফিট দেওয়া হয়েছে, একটা আদেশের মাধ্যমে, যেটা ১৬/১০/২০১৮ তারিখের আদেশ, যেখানে অন্যদের যে সিস্টেম লসের পরিমাণ সেটা কিন্তু তিতাসের সমান না। তিতাসকে অসমভাবে উচ্চ সিস্টেম লস দেওয়ার পিছনে আমাদের আপত্তি ছিল এবং এটার পেছনেও যে দুর্নীতি আছে সেটা আমরা মামলার ভেতরে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছি। অন্যদের যেখানে ১২% রিটার্ন অন রেট বেসড, তিতাস যে সেখানে ১৮% ধরেছে সেটা যে অসম, অন্যায্য, সেই আলোচনাটা আমরা তুলেছি, সেখানে যে শেষ পয়েন্টটা আছে, Direction upon the respondents to adjust the money charged under value-added tax (VAT) and supplementary duty SD since 1993 in violation of the SRO dated 23/11/1993.

এখানে আমরা একটা চমৎকার জিনিস কোর্টে তুলে ধরেছি যে, ২৩/১১/১৯৯৩ সালে সরকারের একটা প্রজ্ঞাপন ছিল যে আপস্ট্রিম থেকে যে গ্যাস আমদানি করা হবে সে গ্যাসের ক্ষেত্রে ভ্যাট/এসডি আরোপ করা হবে না। এটার আমরা একটা হিসেব করে দেখালাম এবং এনবিআর থেকেও একটা চিঠি ছিল, সেখানেও আমরা দেখছি যে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার একটা হিসেব গড়মিল আছে। এখানেও ভ্যাট/এসডির ক্ষেত্রেও যে বিশাল অংকের টাকা তারা জনগণ বা ভোক্তার কাছ থেকে আদায় করেছে সেই টাকার আসলে কোনো হিসাব নেই। হিসাব নেই কেন? আপনারা জানেন যে সরকার যদি জনগণের কাছ থেকে কোনো ট্যাক্স নেয় সেটা যেই ফরমেটের হোক না কেন সেটার স্পেসিফিক একটা ট্যাক্স কোড থাকবে। সেই কোড এর মাধ্যমে রেভিনিউ জমা হবে। কিন্তু এখানে তো ১৯৯৩ সালে সরকার বলে দিচ্ছে ট্যাক্স নেওয়া যাবে না। তবু ট্যাক্স নিয়েছে। সেই টাকাটা কোথায় রাখল? এটা তো দুর্নীতি। এন্টি করাপশন চিঠি দিয়েছে পেট্রোবাংলাকে হিসাব দেন টাকা কই রেখেছেন? এনবিআর বলছে টাকাটা দেও, টাকা তো তোমরা তো কালেকশন করেছ।

তো আমরা প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার গড়মিলের কথা আদালতে তুলে ধরেছি। আমরা কোর্টের কাছে ডিরেকশন চেয়েছিলাম হিসেব দিতে বলেন ওনাদের কাছে টাকাটা কোথাও না কোথাও আছে। তাদের আইনজীবী আদালতে এফিডেবিট তথা হলফনামা দিয়ে বলল, ক্যাবের আইনজীবীর হিসাব ঠিক নেই। ৫০ হাজার কোটি না আমরা ৭০ হাজার কোটি টাকার মতো তুলেছি বা চুরি করেছি যার কোনো হিসেব আমাদের কাছে নেই। আমি নিজেও হিসেব মিলাতে পারি না, কি কারণে এফিডেবিট করল। এফিডেবিটের কথা বার

বার বলছি এই কারণে যে, যখন আপনি আদালতে কোনো এভিডেন্স এফিডেবিট দিয়ে দাখিল করবেন সেটা কিন্তু পাবলিক ডকুমেন্ট হয়ে যাচ্ছে। এই মামলাটায় আমরা একটা অর্ডার পাওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম কিন্তু বিভিন্ন কারণে হয়নি। কেন হয়নি তা আর পাবলিক মিটিং এ বলছি না।

পরে যে আদালতে মামলা চলছিল সেই আদালত এই মামলাটি শুনতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেননি কেন অপারগতা প্রকাশ করলেন। ৬/৭ টি স্পেসিফিক ডিরেকশন তিনি দিয়েছিলেন অথরিটিকে এই হিসাব দেও, ওই নোটিস দেও, এই কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট দেও, অনেক কিছু নিয়েছে। প্রথমে একটা সামান্য রুল নিয়েছিলাম যে কেন এই মূল্য বৃদ্ধিকে অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, বলে চুপচাপ ছিলাম। তারপর ধীরে ধীরে বিল্ড আপ করেছিলাম, ফাইলের সাইজটা দেখলে আপনারা ভয় পাবেন। এতোগুলো ডকুমেন্ট এতোগুলো আদেশ এখানে যুক্ত হয়েছে, সর্বশেষ যে ডিজাস্টারাস এফিডেবিটটা আসল, প্রত্যেকে বিভিন্ন ধরণের নানা চাপে নানান কিছুর কারণে আদালত হয়তো আর শুনতে চাইলেন না। এর পরে অন্তত আরও ৪টা আদালতে আমি গিয়েছি। মামলাটা দেখার পরই সবাই ভয় পেয়ে যায়, না, না এটা শুনব না, অন্য কোথাও যান।

এখন এটা হ্যাঙ্গিং অবস্থায় আছে। কোনো কোর্টে এটা শুনানি করতে পারছি না। অনেকগুলো ইস্যু আছে আমাদের ন্যায্যতা আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে, এনার্জির উপর অনেক কথা আছে, মামলাটা নিষ্পত্তি হলে অনেক কিছু হয়ত আদালতের মাধ্যমে আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারতাম। কিন্তু এখন যে পরিস্থিতির মধ্যে আমরা আছি, এক্সট্রা যদি পুশ না আসে, আপনাদের তরফ থেকে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য মাঠ পর্যায়ে যদি আমরা কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালনা না করতে পারি, আমাদের দাবিটাকে যদি গণদাবি করতে না পারি,তাহলে পূর্ণ সাফল্য আমরা ঘরে তুলতে পারব না। কেবল ক্যাব একটি সংগঠন হিসেবে দাবি তুলছে বিষয়টা এমন নয়, সাধারণ মানুষ সবাই চাচ্ছে যে এটার ফয়সালা হোক, এই যায়গায় যদি আমরা এটাকে পুশ করে নিয়ে যেতে না পারি, তাহলে কোনো আদালতই সাহস করবে না এই মামলাটি শুনার জন্য। কারণ ৭০ হাজার কোটি টাকা যেটা বলেছে এটা হচ্ছে ২০১৯ সালের আলাপ। আজকে ২০২৩ সালে এই সংখ্যাটি নিশ্চয়ই আরও বেড়েছে।

আপনারা দেখেছেন যে পেট্রোবাংলা কিভাবে ২৫টি ব্যাংকের মাধ্যমে তাদের হাজার হাজার কোটি টাকা লগ্নি করে। কিভাবে জনগণের টাকা প্রাইভেট ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে রেখে ব্যবসা করছে। তার কি ব্যবসা করার কোনো মেনডেট আছে? তার কি এই পুঁজি খাটানোর মেনডেট আছে? স্পেসিফিক যে দায়দায়িত্ব তার বাইরে এসে পাবলিক মানি কি তারা অন্য কোথাও ব্যবহার করতে পারে। এটা স্পেসিফিকালি এন্টি করাপশনের বিষয়। এন্টি করাপশন কি করে, আমরা সবসময় সাধারণ নাগরিক হিসেবে এই প্রশ্নটা করি। এই মামলাতে কিন্তু এন্টি করাপশন একটা পক্ষ। এতো কিছু দেখিয়ে দেওয়ার পরও এন্টি করাপশন কমিশন কি কিছু করেছে? মামলাতে তো সমস্ত কিছু এভিডেন্স হিসেবে এসেছে, তারা এটা তদন্ত করে কিছু করতে পারত না? পারত।

এটা তারা করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত জনগণের মধ্য থেকে ওই প্রেশারটা তৈরি করতে না পারবেন। আর কেবলমাত্র কোর্টের আদেশ দিয়ে এই জায়গাগুলো প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। আদালত তো একটা টুল। আদালত অনেক সময় বলে দেয় ওই যায়গায় ওই ঘরবাড়িগুলো করেছে ওগুলো উচ্ছেদ কর, ডিসি তো শোনে না অনেক সময়। ডিসি যে শুনছে না এই খারাপ সংস্কৃতিটা আমাদের আইন না মানার সংস্কৃতিটি, এখান থেকে বের হতে গেলে আইন মানার যে সংস্কৃতি আছে সেটা প্রতিষ্ঠা করতে গেলে, যা করা লাগবে সেটা তো আর কোর্টের মাধ্যমে প্রত্যেকের মাথায় লাঠি দিয়ে আইন মানার সংস্কৃতি তৈরি করতে পারবে না। এটা আমাদের তো সংস্কৃতির অংশ। আমার আপনার শিক্ষাদীক্ষার অংশ যে আমরা আসলে কতটা আইন মানব বা অন্যকে আইন মানতে বাধ্য করব। সেই জায়গাটা যদি আনতে হয় তাহলে সামাজিক আন্দোলন জরুরি। আমি বলছি মামলার কথা কিন্তু তারপরও আপনাদের রেফার করছি সামাজিক আন্দোলনের কথা। আমি না জেনে বলছি না, বুঝে শুনে বলছি। আমার অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে বলছি যে, সামাজিক আন্দোলন খুবই প্রয়োজন। সামাজিক আন্দোলনের জায়গায় এটাকে নিতে না পারলে কেবলমাত্র আইনের জায়গা দিয়ে আমরা যে তর্ক বিতর্কটা উস্কে দিতে পেরেছি, সেটাও আমরা পুঁজি করতে পারব না, সেটা করতে হলেও আমাদের সামাজিক আন্দোলনে যেতে হবে। এনার্জি জাস্টিসের জায়গায় নিয়ে যেতে হবে।

আরও বেশ কিছু মামলা, এনার্জি রিলেটেড, গ্যাস, ইলেক্ট্রিসিটির মতো প্রায় ১৪টা রিট পিটিশন এখনো পর্যন্ত পেন্ডিং। একটা দুটি আছে যেগুলো ইতোমধ্যেই রেজাল্ট পেয়ে গেছি। আমাদের পক্ষে রায় এসেছে। যেমন বড়পুকুড়িয়ার কয়লার খনিতে এমন একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ চার্জ শিটে নাম এসেছে। তিনি বিইআরসির অন্যতম একজন সদস্য হিসেবে কাজ করে যাচ্ছিলেন। আমরা বলেছি এই চোরকে আপনারা বিইআরসির সদস্য বানালেন, যিনি চুরি ঠেকাবেন, মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে রক্ষক হবেন, পাবলিক ইন্টারেস্ট সুরক্ষা দেওয়ার জন্য যাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ধারা ৩৪ অনুযায়ী। তাই এরকম একজন চোর থাকেন কিভাবে। সরকারি আইনেও অভিযোগপত্র চলে আসলে তার আর চাকরি থাকে না, সাসপেনশনে চলে যায়। এই মামলা করার পরে আমরা যথাযথ আদেশ পেয়েছি এবং এটি আমাদের পক্ষে এসেছে। এখন আপনারা বলতে পারেন ওনার চাকরির সাথে আমাদের এনার্জি জাস্টিসের কি সম্পর্ক। সম্পর্ক আছে, উনি তো বিইআরসিতে বসে আছেন। বিইআরসি তো জনগণের প্রতিষ্ঠান। এই রেগুলেটরি বোর্ড শক্তিশালী হওয়া আমাদের প্রয়োজন। ২০২৩ সালে বিশেষ আইন নিয়ে আসল সরকার, দেশের স্বার্থের জন্য প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ে বসে দাম বাড়িয়ে নিতে পারে। অথচ আইন করে বলে দেওয়া আছে যেটার এবসুলেট অথরিটি বিইআরসি, তারা করতে পারবে। ২০২৩ সালে আইন পরিবর্তন করে ফেললো, এটাও কিন্তু ক্যাবের লড়াইয়ের কারণে। ক্যাব একমাত্র প্রতিষ্ঠান আমি বলব যারা শুরু থেকেই এনার্জি রেগুলেটরি অ্যাক্টের অধীনে যে সমস্ত অধিকারগুলো আমাদের দেওয়া হয়েছে, সুরক্ষাগুলো দেওয়া হয়েছে সেটার ইফেক্টিভ ব্যবহার করে আসছে এই আইনগত জায়গাগুলোতে। যার কারণে সরকারও প্রেশার ফিল করেছে যে এটাকে কোনোভাবে তার

অধীনে আনতে হবে না হলে ক্যাবের সাথে পারা যাচ্ছে না। এই জায়গাটা ঘুরাতে হলে সামাজিক আন্দোলন লাগবে। আমাদের এই এক্তিয়ার অধিকার, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরিকে শক্তিশালী করা, যেন আমাদের পক্ষে ওরা কাজ করে সেই জায়গাটায় আমাদের নিয়ে যেতে হবে।

এনার্জির মূল্য কিভাবে হবে সেটার উপরে একটা দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। আপনারা সম্প্রতি দেখেছেন শ্রীলংকার সরকার ফেইল করার পিছনে কারণ ছিল কিন্তু এনার্জি। আমরা ভবিষ্যতে যদি ফেইল করি তাহলে এনার্জির জন্য ফেইল করব। আমরা যদি ঘুরে দাড়াই তাহলে এনার্জির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেই ঘুরে দাঁড়াতে পারব। আমাদের সম্ভাবনা অনেক বেশি, অনেক কিছু করার মতো যোগ্যতা শক্তি, সামর্থ্য সবই আমাদের আছে। কিন্তু সেটাকে বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদের সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে এই জায়গায় জাস্টিস প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটা আমাদের নিজেদের বোঝা এবং আরও বেশি করে এর সাথে সংযুক্ত হওয়া, নিজের অংশগ্রহণ করা এবং অন্যদের অংশগ্রহণের জন্য সচেতন করা যে, কিভাবে আমরা এনার্জি জাস্টিসকে একটা গণআন্দোলনের মাধ্যমে স্থায়ী একটা আইনে রূপ দিতে পারব। আইন এমনিতে হবে না। আমি যদি বলি, এগুলো আইনে স্বীকৃতি নেই, সমস্যা আছে, এই আফসোস করার মাধ্যমে আরও দুই যুগ পার করে দিতে হবে যদি আমরা এখনি নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভূমিকা পালন না করি। আমরা এখনই যদি উদ্যোগ না নেই, আগামী দুই দশক পরে গিয়ে এই কথা বলতে থাকব। আমি এতোটুকু বলেই সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করছি।

অধ্যাপক এম শামসুল আলম

অনুষ্ঠান সূচি অনুযায়ী কথা ছিল, এনার্জি ট্রানজিশন অ্যান্ড প্রিডেটরি কস্ট ইন পাওয়ার এনার্জি সাপ্লাই নিয়ে আলোচনা করা। আমি সেই আলোচনায় যাচ্ছি না। আপনাদের প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে আমি চেষ্টা করব এর ব্যাখ্যাগুলো ভালো করে দেওয়ার। তিনটি উপস্থাপনা আপনারা শুনলেন। প্রথমটিতে জ্বালানি খাতের তথ্য-উপাত্তগুলো উঠে এসেছে। এসব তথ্যের ভিত্তিতেই আমরা বিভিন্ন জায়গায় মুভ করছি। আমাদের দাবি দাওয়া তুলে ধরছি। পরের দুটি আলোচনায় আপনারা জানলেন যে, জ্বালানি ন্যায়বিচারের জন্য আমাদের করণীয় কি এবং আমরা কি করছি, সেখানে চ্যালেঞ্জগুলো কোথায়। যাই হোক, প্রথম আলোচনার সূত্রে আমি তিনটি বিষয় আবার আপনাদের কাছে উল্লেখ করতে চাই। ১২% হারে বিদ্যুতের ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে ৮% বা ৭% ডিমান্ড বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে। তার মানে চাহিদা নেই। ৩৩% ক্যাপাসিটি অতিরিক্ত ডেভেলপ করে দেওয়া হচ্ছে গত দেড় থেক দুই দশক ধরে। এই একটা পয়েন্ট সেখানে এসেছে।

দ্বিতীয় পয়েন্টটা হলো, পাবলিক সেক্টরকে দুর্বল করে ফেলা হচ্ছে। প্রাইভেট সেক্টর তার জায়গা দখল করছে। এবং নানা সময় নানা পলিসি দিয়ে প্রাইভেট সেক্টরের রিস্ক ফ্রি করে দেওয়া হচ্ছে। রিস্ক বাবদ যত রকমের খরচ তা পাস থ্রু করার পলিসি তৈরি হচ্ছে। এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের ভোক্তাদের রাইট অফ ইন্টারেস্ট প্রটেক্ট করতে গিয়ে যে

ধরনের ট্যারিফ সাজেস্ট করার কথা ছিল তারা সাবসিডি দিয়ে ট্যারিফ রেগুলেট করেছে। কিন্তু ঘাটতি যেটা তৈরি হচ্ছে প্রিডেটরি কস্ট যেটাকে বলছি, লুণ্ঠনমূলক যে ব্যয় সংযোজন করা হয়েছে, সেই ব্যয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করার কোনো রকম পদক্ষেপ নেয়নি। পরবর্তীতে সরকার যে পলিসি তৈরি করল, আইন তৈরি করা হলো, সেই আইনে আর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আগানোর পথ খোলা রইল না। বিডিং ছাড়াই মানে সরাসরি পারচেজের মাধ্যমে প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে এই প্রিডেটরি কস্ট, ঘাটতি আরও বেশি বেড়ে গেছে। তারপর যখন মূল্য হার সমন্বয় হারের প্রশ্ন এসেছে যেটা ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বলেননি। সেই জায়গাটা দাঁড়িয়ে গেছে যে, ট্যারিফ নির্ধারণের ক্ষমতা সরকার আইন পরিবর্তন করে নিজের হাতে নিয়েছে। যে ঘাটতিটাকে জাস্টিফাই করে গেছে রেগুলেটরি কমিশন সেটাকে এখন এডজাস্ট করে মূল্য হার বৃদ্ধি করছে। এই যে জায়গাটায় আমরা দাঁড়িয়েছি তা আলটিমেটলি তথ্য দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং সেখানে এটাও দেখানো হয়েছে যে, আমাদের যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের স্টাডি অনুযায়ী, আমি মনে করি সেটাও কনজারভেটিভ স্টাডিজ রিনিউয়েবল এনার্জির সোলার এর ৫০ হাজার মেগাওয়াট পটেনশিয়াল আছে। আমাদের রিনিউয়েবল এনার্জি এটা কৃষির ফসল হয়ে গেছে। বিশ্বে এমনকি রাজস্থানে ইতোমধ্যে প্রমাণ হয়ে গেছে তার উপর একটা টেকনিকাল পেপার আমার কাছে রিভিউর জন্য এসেছিল। এটা সরকার প্রমোট করছে। ৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত উৎপাদন করে তারা সেটা বিক্রিও করতে পারছে। তারা ফসলও পাশাপাশি চাষ করতে পারে। এ সংক্রান্ত সব জিনিসের দাম অলরেডি নেমে এসেছে, সেসব নিয়ে এর মধ্যে আলাপ হয়েছে যে, তাদের প্রতি ইউনিট চার রুপির নিচে নেমে এসেছে। এখানে যে রিনিউয়েবল এনার্জির আরেকটি আইনের কথা আসেনি, রিনিউয়েবল এনার্জির বিদ্যুতের দাম ৩০ টাকা দরে বিক্রি হবে বলা হল। পরবর্তীতে তারা ৩৫ টাকা রেঞ্জে অফ-গ্রিডে ইলেক্ট্রিসিটি বাড়ানোর জন্য আবেদন করে সরকারের কাছে। এবং সেই আবেদন চলতে থাকে। পরে সরকার উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে অফ গ্রিডে বিদ্যুৎ কিনেছে ২১ টাকা দরে। এটা অলরেডি অর্ডার হয়ে গেছে। কিন্তু সেই মূল্যটা যৌক্তিক কিনা এটা কিন্তু যাচাই বাছাই হয়নি। সেটা সরকার কিনেছে। সরকার ভোক্তাদের বিদ্যুৎ দেবে এই ট্যারিফে, বিদ্যুৎ উচ্চ মূল্যে কিনতে হবে। রিনিউয়েবল এনার্জি সরকার অফ গ্রিডে বিক্রির ব্যবস্থা করেছিল। সেটা ন্যাশনাল গ্রিডে ট্যারিফ হিসেবে এনেছিল। এখানে অন্তত সমতা আছে।

এনার্জি জাস্টিসের মৌলিক যে জায়গাটা তা হচ্ছে, অসমতাগুলো সমবণ্টন হতে হবে। সমবণ্টন করার নিশ্চয়তা দিতে হবে, এটাই এনার্জি জাস্টিস। যেমন পরিকল্পিত যে লোডশেডিং এর কথা বলা হল, সেখানে দেখা গেল ৩৩ কেভি কিলোওয়াটকে লোডশেডিং এর বাইরে রাখা হল। লোডশেডিং শেয়ারিংয়ে অসমতার জায়গাটা বাড়িয়ে দেওয়া হল। বলা হল লোডশেডিং হবে এনার্জি সেভ করার জন্য। বিদ্যুৎ উৎপাদন কম করলে জ্বালানি সেভ হবে ডলার সেভ হবে। সুতরাং সরকারের উপর চাপ কমবে। কিন্তু ক্যাপটিভ পাওয়ারে বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়ে গেল। এবং এনার্জি কনজাম্পশন বেড়ে গেল, অসমতা বণ্টনে সমতা আসল না। অনেক ১১ কেভি কনজুমার যারা কমার্শিয়ালি ছিল, আমার ইউনিভার্সিটির, তারা ৩৩

কেভিতে আপগ্রেডেশন করে নিয়ে গেল। ৫ মেগাওয়াট থেকে ১০ মেগাওয়াটে নিয়ে গেল। সুতরাং এই যায়গাগুলোতে কনজুমার পার্সপেক্টিভ নিয়ে আমরা যদি সমবেত না হই, যেখানে যেটা হচ্ছে তা নিয়ে সোচ্চার না হই, তাহলে আদালতের আদেশ যে হয়ে যাচ্ছে সেটাও আপনারা জানবেন না।

এই যে ওয়াসার পানির ব্যাপার নিয়ে যেটা ঘটে গেছে। ৩০ কোটি টাকা পারফরম্যান্স বোনাস দেওয়া হয়েছিল, কোর্ট সেটাকে বাতিল করেছে। ক্যাবের মাধ্যমে সেটা হয়েছে। নগরে যে পানির মূল্য বৃদ্ধির পাঁয়তারা চলছিল সেটা এখন থমকে দাঁড়িয়েছে। এবং এটা আপিল ডিভিশনে গিয়েছে হাই কোর্ট তা বহাল রেখেছে। ওয়াসার আবেদন শুনেনি। ওয়াসা যেভাবে পানির মূল্য নির্ধারণ করে সেটা হাইকোর্ট বেআইনি ঘোষণা করেছে। সুপ্রিম কোর্টের কাছে তারা স্থগিত চেয়ে আপিল করবে বলেছে। সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার স্থগিত করেছে, কিন্তু বলেছে আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ওয়াসা কোনো মূল্যবৃদ্ধি করতে পারবে না। ঔষধের মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে প্রিডেটরি কস্ট এর কথা বলা হল, লুণ্ঠনমূলক অযৌক্তিক অন্যায় ব্যয়ের কথা বলা হল, তার চিত্রটা হলো, ঔষধের মূল্য ৪/৫ গুণ বাড়ানো হয়েছে। সেটা নিয়ে ক্যাব প্রতিযোগিতা কমিশন থেকে প্রশাসনিক প্রতিকারের জন্য পদক্ষেপ চেয়েছিল এগুলো সব বাতিল করার। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গোটা দাবির পক্ষে অবস্থান নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে নির্দেশনা দিয়েছে এবং সেটা প্রতিযোগিতা কমিশন থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে বলা হয়েছে। এই যে বলার জায়গাগুলো এখন তৈরি হয়েছে, তৈরি হচ্ছে এবং ধরে নেওয়া হচ্ছে ওয়াসার এখন রিস্ট্রাকচার করতে যাচ্ছে সরকার। হয়ত এই বছরের শেষের দিকে বা ভেতরের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এই ব্যাপারগুলো যেই জায়গা থেকে শুরু হয়েছে, অসহায়ত্বের জায়গা থেকে। সেখান থেকে আজ যে আলো দেখা যাচ্ছে, সেই মেসেজটা আপনারা নিয়ে যান।

আমরা এবার আপনাদের প্রশ্ন শুনব।

আজাদুল ইসলাম আজাদ

সভাপতি, ক্যাব নওগাঁ জেলা কমিটি

যখন কোনো বিচারক মামলার শুনানি নিতে চাচ্ছে না, বিচার করতে চাচ্ছে না, তখন আমার অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে কিনা? আর ক্যাবের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে যদি কোনো কর্মসূচি ঘোষণা দেওয়া হয়, দিন তারিখ উল্লেখ করে কোনো ইস্যু নিয়ে কর্মসূচি পালন করার, তাহলে ক্যাবের যেহেতু ৬৪ জেলায় জেলা কমিটি রয়েছে, সেই কর্মসূচি কেন্দ্র থেকে একই দিনে সকল জেলায় পালন করার উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা?

ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া

ন্যায়বিচার পাওয়া সকল নাগরিকের অধিকার। যদি কোনো আদালত তা শুনতে না চায়, তাহলে তা আমাদের অধিকার খর্ব করে। আমি যে বিষয়টা তখন বলিনি, আদালত কখন বিব্রত বোধ করে সেটারও কতগুলো সুনির্দিষ্ট নীতি আছে। এখন আমি আইনজীবী হিসেবে

ক্যাবের পক্ষ থেকে মামলা লড়ছি, যখন আমি বিচারক হয়ে যাব, যদি এই ধরণের কোনো ইস্যু আসে তাহলে আমার মামলা শুনার কোনো সুযোগ নেই। কারণ আমার সেই মামলায় সফট কর্নার কাজ করবে। পক্ষ বিপক্ষের ব্যাপার যেখানে থাকবে, স্বার্থের দ্বন্দ্ব যেখানে থাকবে সেখানে আমি মামলা শুনতে পারব না।

যদিও আমরা এখানে খুব নিরীহভাবে এই আলাপ করছি, কিন্তু এটা হাইলি পলিটিকাল আলাপ। আমরা যেটা করছি এটা পিপলস পলিটিকস। নাগরিকের অধিকার তো একটা বড় রাজনৈতিক প্রশ্ন। ক্ষমতার রাজনীতি করে যারা, তারা সবাই বলে যে, আমরা সবাই জনগণের জন্য কাজ করছি। আমরাও বলছি আমরা জনগণের কথা বলছি, আর এরা জনগণের কথা বলছে না। ফলে এটাও একটা পলিটিকস। পলিটিকস, প্রেশার বিবেচনা করেই ওনারা মামলার শুনানি নিচ্ছেন না। এটা ওনাদের শপথ ভঙ্গ করার মতোই। আসলে তাদের না শোনার বা রিফিউজ করার কোনো এক্তিয়ার নেই।

অধ্যাপক এম শামসুল আলম

আমরা যেসব কর্মসূচির কথা ভাবছি, যেটা সমন্বিতভাবে সমস্ত জেলায় উপজেলায়, একইভাবে যেন প্রতিপালিত হয়। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির ব্যাপারে বিভিন্ন জায়গায় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এগুলো কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বয় করে যাতে প্রতিপালিত হয় সেই প্রেক্ষাপটে নানা ধরেনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তার জন্যই আজকে আপনাদের এখানে ডাকা এবং যেসব করণীয় রয়েছে, তা সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালনের একটা পথ বের করা।

ডা. মো: আবু তাহের

সভাপতি, ক্যাব মৌলভীবাজার জেলা কমিটি

আমাদের আইনের ব্যত্যয় হচ্ছে, ক্যাব ক্রমাগত আন্দোলন করে যাচ্ছে, আমরা জনগণ বিশেষ করে গ্রামের জনগণ বিদ্যুৎ পাচ্ছি না। ক্রমাগত লোডশেডিং হচ্ছে। এখানে আমাদের করণীয় কি?

অধ্যাপক এম শামসুল আলম

আমাদের কাজ হলো এনার্জি রাইট এন্ড জাস্টিস এনশিউর করে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা। এবং এনার্জি সেক্টরে আমাদের সক্ষমতা অর্জন করা, স্বনির্ভরতা অর্জন করা। সেই ক্ষেত্রে রিনিউয়েবল এনার্জির যে পটেনশিয়াল আছে, সেই পটেনশিয়ালিটি থাকা সত্ত্বেও জ্বালানি সেক্টরটা যে কিছু লোকের স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে সেখান থেকে মুক্ত করা। রিনিউয়েবল এনার্জির ইলেক্ট্রিসিটির মার্কেটটাকে প্রতিযোগিতায় আনা। বিদ্যুৎ খাতকে আমদানি মুক্ত করা, আদানির বিদ্যুৎ, এসবের তুলনায় অনেক কম দামে রিনিউয়েবল এনার্জি নিজের মতো করে তৈরি করা সম্ভব। তাহলে হাইড্রো ফুয়েল, ডিজেলের দাম উত্থান পতন দেখিয়ে বিদ্যুতের

মূল্য বৃদ্ধির কোনো সুযোগ থাকে না। এই জায়গাটিতে আমরা সোচ্চার হতে চাই। অধিকারের জায়গা জাস্টিসের জায়গা নিশ্চিত করতে চাই। আপনি আপনার মতো করে যেখানে সুযোগ পাবেন বলবেন। কিন্তু যদি আপনি আপনার বঞ্চিত হওয়াটাকে সার্বিকভাবে মেনে নেন, তাহলে এখান থেকে গিয়ে এই বিষয়ে আর কথা বলবেন না। আর যদি মেনে না নেন তাহলে আপনার সংক্ষুব্ধতা কোনো না কোনোভাবে প্রকাশ পাবেই। আর এটি একতাবদ্ধভাবে সম্মিলিতভাবে এক হয়ে পরিকল্পনা করে কর্মসূচি পালন করতে হবে।

আমরা প্রথমত যে আন্দোলনটা শুরু করতে চাচ্ছি, ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একটা ভোক্তা অধিকার মন্ত্রনালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। আইন প্রচুর আছে যার দ্বারা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা যায়, ভোক্তার অধিকার বলবৎ করা যায়। কিন্তু আমরা এটাও দেখছি এসব আইন যথেষ্ট না। এখন আমরা আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে আইনের স্বচ্ছতা ও সুরক্ষা চাই। মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় আছে, নানা মন্ত্রণালয় আছে, কিন্তু ভোক্তাদের জন্য কেন মন্ত্রণালয় থাকবে না, কারণ ভোক্তারাই হচ্ছে আপামর শতভাগ জনতা।

এরকম কিছু সুনির্দিষ্ট আলোচনার মাধ্যমে ছয় দফার মতো দাবি বেরিয়ে আসবে। ছোট ছোট আমাদের টিম যাচ্ছে, সব জেলায় যাওয়া শুরু হয়ে গেছে ২০২২ এ গেছে ২০২৩ সালেও যাচ্ছে। এই বছর একবারে কন্টিনিউয়াস, রুট লেভেলে, ডিভিশন, জেলাগুলোতে, আপনাদের বাসায় বাসায়, ড্রয়িং রুমে বসে আলাপ করবে যে আমরা কতটুক শক্তি সঞ্চয় করলে মন্ত্রণালয় পাব। আমরা রিনিউয়েবল এনার্জিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব, লুণ্ঠন ব্যয় থেকে বিদ্যুৎকে মুক্ত করতে পারব। বিদ্যুতের বাজারে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড প্রতিষ্ঠা করতে পারব। সরকারের কাজ জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করা, সুতরাং সরকারকে দিয়ে এসব দাবি প্রতিষ্ঠিত করা, এটাই আমাদের করণীয়।

সিদ্দিকুর রহমান হাওলাদার

অভিযান বিষয়ক সম্পাদক, ক্যাব
পটুয়াখালী জেলা কমিটি

আমি অনেক প্রশ্নের উত্তর ইতোমধ্যে পেয়েছি। সৌরবিদ্যুৎ আমরা অতি সহজেই পেতে পারি, সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমরা সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলবো এবং এখানে আপনারা আছেন আপনাদের ওপর আমরা আশাবাদী যে আমরা একসাথে এটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো, ধন্যবাদ।

মোছা: দিলারা পারভীন

সদস্য, ক্যাব, মেহেরপুর জেলা কমিটি

খাদ্যের দাম বৃদ্ধির জন্য, সবজির দাম বৃদ্ধির জন্য, ম্যাজিস্ট্রেটরা দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি পেলে মোবাইল কোর্ট বসায়, এছাড়া জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি ও নানা অজুহাতে ঘন ঘন বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি হয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা যদি আন্দোলন করি তাহলে আপনাদের সহযোগিতা

পাব কিনা এবং আমাদের আন্দোলন করার আইনগত অধিকার আছে কিনা?

অধ্যাপক এম শামসুল আলম

ভোক্তার অধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভাবে হোক অথবা ক্যাবের সাথে সমন্বয় করে আন্দোলন করা হোক সে ক্ষেত্রে আমরা সেই সমস্ত দরখাস্ত ফলোআপ করি। যেগুলো সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানোর মতো মেরিট হয় যে, এই বিষয়ের প্রতিকারের জন্য হাইকোর্টে যাওয়া সম্ভব, তাহলে আমরা হাইকোর্ট পর্যন্ত যাই।

আমরা দেখেছি, পাঠ্যপুস্তকে পাতা অর্থাৎ কাগজ ভালো মানের না হওয়ায়, খারাপ কাগজ দিয়ে ছাপা হওয়ায় মামলা করা হয়েছে। আপনি একজন ভোক্তা হয়ে ঠকেছেন, সেটা প্রমাণ করতে হবে। শুধু প্রমাণ করতে হবে যে আপনি একজন ব্যক্তি নন, এই সমস্যায় আরও অনেক মানুষই প্রতারিত হয়েছে। আপনারা এইসব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রমাণ দেন। আমরা প্রমাণ পাই না, এটাই সমস্যা। আপনারা দেখান আপনি একা না, শত শত মানুষ এভাবে সমস্যাগ্রস্ত হয়েছে, এখানে পাবলিক ইন্টারেস্ট থাকতে হবে।

মঞ্জু রাণী প্রামাণিক

সাধারণ সম্পাদক ক্যাব, টাঙ্গাইল জেলা কমিটি

শামসুল আলম স্যার যে প্রস্তাবটা দিয়েছে যে ভোক্তা মন্ত্রণালয় চাই, আমরা এই বিষয়ে সবাই একমত এবং স্বাগত জানাই এবং এটার জন্য আমরা আন্দোলন করবো। পল্লী বিদ্যুত সমিতির বিদ্যুতের মূল্য বেশি তাই জনগণ এর সুফল পাচ্ছে না। গ্রামে গঞ্জে যে বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে দেখা যাচ্ছে সারাদিন মানুষ বিদ্যুৎ পাচ্ছে না। কিন্তু মাস শেষে বিদ্যুতের বিল পে করতে হয়। এখানে যেন ন্যায্যতা পাওয়া যায় (এটা আমি তুরিন আফরোজ আপার কাছে জানতে চাচ্ছি)।

২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়ন করার কথা, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ যাওয়ার কথা এইখানে কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে সে প্রশ্নটিও রাখছি।

আর শেষ প্রশ্ন হচ্ছে আমরা জীবাশ্ম জ্বালানির বিপরীতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার প্রতিষ্ঠায় কিভাবে লড়াই-সংগ্রাম করব এবং এই ক্ষেত্রে ক্যাবের দিক নির্দেশনা কি?

ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ

আপনি বলেছেন ইলেক্ট্রিসিটির সার্ভিস পাচ্ছেন না, কিন্তু আপনাকে মাসে বিদ্যুৎ বিল দিতে হচ্ছে। এটার ক্ষেত্রে আপনার যে ন্যায্যতা সেটা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন আপনি। কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা সবাই একত্র হয়ে কাজ করছি কি? আপনার এলাকা, আমার এলাকা একই তো কাহিনী। আমরা এই রেকর্ড কেন ক্যাবের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি না। একটা মাসের হিসাব ধরেন যে আপনার এলাকায় সবাই এই সমস্যায় পড়েছে সেই রেকর্ডটা পাঠিয়ে দেন। তাহলে এই এভিডেন্স বিচার বিবেচনা করে কোর্টে যাওয়া হবে।

অধ্যাপক এম শামসুল আলম

ভোক্তার অধিকার আদায়ের জন্য মন্ত্রণালয় দরকার সেটা আমি ইতোমধ্যে বলেছি। আর এসডিজির কথা বলতে গেলে, এসডিজি বাস্তবায়ন এনার্জি ক্ষেত্রে চরম অনিশ্চিত।

সরকার গ্যাস এর ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে কমিটমেন্ট করে যে, গ্যাস সরবরাহ করবে। এর জন্য আমাদের কাছ থেকে দাম বাড়িয়ে নিয়েছে, বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে বলে, ৬-৭% প্রবৃদ্ধি হারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে এর জন্য গ্যাস দরকার, এদিকে গ্যাস আমদানি কমিয়েছে, বিদ্যুৎ উৎপাদন কমিয়েছে, এর ভেতরে কি ঘটেছে তা অঙ্কে এখনো আসেনি। আগামী বছরগুলো বিশেষ করে চলমান ২০২৩ সাল অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার কাল।

আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপগুলো সামনের বাস্তবতার উপর নির্ভর করছে। যেকোনো কারণে আমাদের কোনো আন্দোলন রাজনৈতিক হাতিয়ার হতে পারে। কারণ সামনে ইলেকশন, সুতরাং সেই ব্যাপারে আপনাদের কথা বার্তা বলার ক্ষেত্রে সাবধান হতে হবে। কারণ আমাদের সংগঠন রাজনৈতিক সংগঠন নয়। রাজনৈতিক যদি হয়ে যায় তাহলে অনেক ঝুঁকি, অনেক মূল্য দিতে হবে আপনাদের এবং ব্যক্তি পর্যায়ে দিতে হবে। সেটা ভালো করে খেয়াল রাখবেন। রাজনীতির পরিবর্তন হবে কিন্তু আমদের এই আন্দোলনের পরিবর্তন হবে না।

তৌহিদুল ইসলাম লিটন
সাধারণ সম্পাদক, ক্যাব
লালমনিরহাট জেলা কমিটি

জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিদ্যুতের মূল্য কম হবে, প্রথম আলোচক যেটি বলেছিলেন। লালমনিরহাট জেলায় ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রয়োজন সেখানে ৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সোলার এনার্জি দ্বারা তৈরি হচ্ছে, সেটা জাতীয় গ্রিডে যোগ হচ্ছে কিন্তু আমরা সুলভ মূল্যের বিদ্যুৎ পাচ্ছি না। এর জন্য ক্যাব এর থেকে কোনো আইনি সহযোগিতা কিংবা প্রচারণা চালাতে পারি কিনা?

অধ্যাপক এম শামসুল আলম

জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুৎ জাতীয়ভাবে ইউনিফাইড ট্যারিফে ডিসট্রিবিউশন হয়। সেজন্য শহরের ট্যারিফ আর গ্রামের ট্যারিফ এক। কিন্তু শহরের বিদ্যুৎ নিরবচ্ছিন হয় আর গ্রামের মানুষ ইন্টারাপ্টেড বিদ্যুৎ পায়। এই যে অসমতার জায়গা এই জায়গা ধরে আমরা কাজ করছি। আর এটাই এক সময় সামনে আসবে।

আপনি যেটা বললেন, রিনিউয়েবল এনার্জি জাতীয় গ্রিডে যোগ হলে, সেটার কারণে যদি মূল্য কমে বা বাড়ে সেটা ওভারঅল যে জেনারেল ট্যারিফ সেখানে রিফলেক্ট করবে কিন্তু অঞ্চল বিশেষ কোনো প্রভাব পড়বে না। আপাতত রিনিউয়েবল এনার্জির পরিমাণ খুবই

ইনসিগনিফিকেন্ট। ১% এর কম, ১% এর বেশি ক্যাপাসিটি দিয়ে দেখানো হয়। এটার ট্যারিফ রিফলেক্ট করছে না। আগামী ১০ বছরেও করবে কিনা এটা প্রশ্ন থেকে যায়। আমি আগেই বলেছি রিনিউয়েবল এনার্জি এবং বিদ্যুতের বাজার অলিগোপলির শিকার। রিনিউয়েবল এনার্জি অসমতার শিকার। অসমতাকে ভাঙ্গাই হচ্ছে এনার্জি জাস্টিস। এনার্জি জাস্টিস এখানে এনশিওর করতে হবে।

আলম সারোয়ার টিটু
সভাপতি, ক্যাব, কিশোরগঞ্জ জেলা কমিটি

মৌলিক অধিকারের মধ্যে বিদ্যুৎ নেই। সংবিধান সংশোধন করে বিদ্যুৎকে কিভাবে মৌলিক অধিকারের মধ্যে আনা যায়?

অধ্যাপক এম শামসুল আলম

সংবিধানে স্পষ্ট করে বলা থাকুক আর না থাকুক বিদ্যুৎ মৌলিক অধিকারের মধ্যে এক নম্বরে চলে গেছে। বাসস্থান থেকে শুরু করে খাদ্য প্রসেসিং, প্রিজারভেশন, সবকিছুর জন্য বিদ্যুৎ লাগবে। হারভেস্টের জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজন। বিদ্যুৎ লাগবে না এমন কোনো জায়গা নেই। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এসব মৌলিক অধিকার বিদ্যুৎ ছাড়া কিভাবে সম্ভব? সুতরাং বিদ্যুৎ মৌলিক অধিকার কিনা এটা সংবিধানে থাকুক আর না থাকুক এটা রাইট টু লাইফের মধ্যে এসে গেছে। সরাসরি না লেখা থাকলেও সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় যে অধিকারের সুরক্ষা দেওয়া আছে, এছাড়া সংবিধানের ২৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা আছে যে সমতার কথা, সেটা দিয়েও আমরা এনার্জি সেক্টরে অনেক কিছু আনতে পারছি। তাই এটাকে নতুন করে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমাদের আন্দোলন করার দরকার নেই।

এম. নাজমুল আজম ডেভিড
সাধারণ সম্পাদক, ক্যাব, খুলনা জেলা কমিটি

অব্যবস্থাপনার কারনে খুলনা অঞ্চলে পানির লবণাক্ততার সমস্যা বৃদ্ধি পাওয়া এবং অন্যায্য পানির বিল। এগুলোর সমাধান কিভাবে হবে?

ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া

পানির লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়া এবং সোর্স থেকে কি হচ্ছে, সেটা আইনের মধ্যে গিয়ে বিচার বিবেচনা করার ব্যাপার আছে। যদি কোনো এলাকায় সুপেয় পানির স্তর নীচে নেমে যায় লবণাক্ততা বেড়ে যায়, সেটা কিভাবে হচ্ছে তা না দেখে বলা মুশকিল। এগুলো তদন্ত করে এগোতে হবে।

পানির বিল কিভাবে নির্ধারণ হবে সেটা ওয়াসার আইনের মধ্যে স্পষ্ট করা আছে।

ওয়াসার আইনগত ব্যত্যয় হলে তার জন্য আপনি আদালতের দ্বারস্থ হতে পারবেন।

অধ্যাপক এম শামসুল আলম

আমাদের টেকনিকাল সাপোর্ট দরকার। কাজগুলো করিয়ে আনা দরকার। আপনারা ওয়ার্কগুলো করে, ডকুমেন্টগুলো আনেন। আনলে তারপরে আমরা আমাদের পর্যায়ে এগুলো এনালাইসিস করব। ঢাকা ওয়াসায় দুইটি প্রজেক্ট নেয়া হয়েছিল ২০২৩ সালে। তাদের যে ডিমান্ড ছিল পূরণ করার জন্য এখনো সে ডিমান্ড বাস্তবায়ন হয়নি। এখন তারা পদ্মা, মেঘনার পানি আনতে যাচ্ছে এবং তা অনেক ব্যয়বহুল হবে। এটা নিয়ে আমরা হয়তো ওয়াসার ব্যাপারে কোর্টে যাব। এরমধ্যে আপনি যদি খুলনা থেকে কাগজগুলো আনতে পারেন এবং আমরা আইনি জায়গাগুলো গুছিয়ে আনতে পারলে পদক্ষেপ নেয়া যাবে। কারণ দুটি প্রবলেম আমাদের কাছে মনে হচ্ছে সিমিলার। সুতরাং আপনারা সেই হোমওয়ার্ক করে দেন, পেপারগুলো আনেন।

আহমেদুল হক খোকন
সদস্য, ক্যাব, ফেনী জেলা কমিটি

বিদ্যুৎখাতে ক্যাপাসিটি চার্জ এর নামে হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়ে ক্যাব কোনো আইনি পদক্ষেপ নিয়েছে কিনা। আর না নিলে নেয়ার সুযোগ আছে কিনা?

অধ্যাপক এম শামসুল আলম

আদালতে অলরেডি অ্যাপ্লিকেশন পেন্ডিং আছে। নানাভাবে তারা আমাদের কাছ থেকে টাকা বেশি নিয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের কম্পিটিশন আইনের আওতায় আনা হচ্ছে। আমাদের কাছ থেকে যে টাকা লুট করে নিয়েছে তার একটা এনালাইসিস করা হয়েছে। আমরা এর আওতায় আইনি বিধান দিয়ে সে টাকা ফেরত চেয়েছি। অযৌক্তিকভাবে যে অন্যায় ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করে লুণ্ঠনমূলকভাবে আমাদের কাছ থেকে যে টাকা নেয়া হয়েছে, সেই টাকা ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে গ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা যেমনভাবে মামলা লড়েছি, সেভাবেই এখানেও পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। গ্যাসের ক্ষেত্রে সাপ্লিমেন্ট ডিউটি এসডি ভ্যাট বাবদ ৭০ হাজার কোটি টাকা চিহ্নিত করেছি। সেটা যেমন ফেরত চেয়েছি, এটাও ফেরত পাওয়া সম্ভব। তবে পর্যায়ক্রমে আমাদের কিছু আইনি স্টেপ নিতে হবে।

মালেকা ইয়াসমিন
সহ-সভাপতি, ক্যাব, পঞ্চগড় জেলা কমিটি

কেন্দ্র থেকে জেলা পর্যায়ে যদি এই ধরনের সেমিনার করা যেত তাহলে অনেক ভালো হতো যেহেতু বলা হয় "প্রচারেই প্রসার ঘটে"।

অধ্যাপক এম শামসুল আলম

জেলা পর্যায়ে ২০২৩ সালের অলরেডি সিডিউল হয়ে গেছে। আপনার জেলাতে কোনো না কোনো সময় আমাদের টিম যাবে এবং আপনি চিঠি পাবেন। আপনাদের সঙ্গে সরাসরি বসে বিস্তারিত আলাপ হবে এবং কর্মপদ্ধতি ঠিক করে কাজ করা হবে।

মো: শফিকুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক, ক্যাব, দিনাজপুর জেলা কমিটি

দিনাজপুর জেলায় নেসকো আমাদের ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এই ব্যাপারে ক্যাবের চিন্তাভাবনা আছে কিনা? এছাড়া পানি সংকট এবং তিস্তা নিয়ে যে সমস্যা আছে, সে বিষয়ে আপনাদের কোনো ক্যাম্পেইন আছে কিনা?

অধ্যাপক এম শামসুল আলম

নেসকোর ব্যাপারে আমাদের কাছে অলরেডি কিছু মৌখিক অভিযোগ এসেছে। আমরা প্রত্যেককে বলেছি যে প্রমাণসহ অভিযোগগুলো দাখিল করেন, আমাদের কাছে পাঠান। আর নেসেকোর ব্যাপারে অবশ্যই আমরা চিন্তিত। তাদের কাজকর্ম আমরাও তদন্ত করব।

তিস্তা ব্যারেজ বা সেখানকার পানি সমস্যা একটা অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক ইস্যু। পানি বিষয়ে আমাদের যে বিশেষজ্ঞরা আছে স্থানীয় পর্যায়ে তাদের নিয়ে গিয়ে হয়তো আমরা আপনাদের সাথে কথা বলব। আমরা যারা এখানে আছি পানির ট্যারিফ নিয়ে ইতিমধ্যে কাজ করেছি। বিদ্যুতের ট্যারিফ নিয়ে যেহেতু অনেক কাজ করেছি তাই পানির ট্যারিফ নিয়ে কাজ করা সহজ, এটা নিয়ে কাজ চলতে থাকবে। কিন্তু তিস্তায় যে পানির সংকট এটা নিয়ে কাজ করা আমাদের জন্য প্রয়োজনীয়। বিশেষজ্ঞ লোকবল আছে অনেক। কিন্তু রিমোট এরিয়া অঞ্চলে অঞ্চলে গিয়ে এই সংকটের তীব্রতাটা আইনের জায়গায় মেলানোটা একটু সময়সাপেক্ষ। ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ ওইদিকে যাচ্ছেন। উনি আপনাদের এই ব্যাপারটা ওখান থেকে তুলে ক্যাবের ব্যানারে আনুক। সেই অনুরোধ তাকে জানালাম।

নবী-নওয়াজ মো: মুজিবুদ্দৌলা সরকার কনক
সাধারণ সম্পাদক, ক্যাব, যশোর জেলা কমিটি

ইরিগেশনের জন্য সোলার এনার্জিচালিত পাম্প নিতে গিয়েছিলাম, প্রথমে ইডকল বলেছে ২২ লাখ, কয়েক বছরে এর দাম বেড়ে উঠেছে ৭২ লাখে। তারা বলেছে ১০০ বিঘায় পানি দেওয়া যাবে, কিন্তু যারা নিয়েছে তারা বলছে ৫০/৬০ বিঘার বেশি পানি দেওয়া যাচ্ছে না। যারা নিয়েছে তারা সবাই এখন বিপদগ্রস্ত। যারা বিকল্প এনার্জির দিকে যেতে চাচ্ছে, তারা যেন নিজেরা টিকে থাকতে পারে এবং এটা যেন রিজনেবল দামে পাওয়া যায়, সেটা কিভাবে নিশ্চিত করা যায়?

অধ্যাপক এম শামসুল আলম

যারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তাদের বিস্তারিত তথ্যাদি এনে আমাদের দিন। তাদের সাক্ষর নিন, প্রয়োজনে একটা প্রতিবাদ সভা করে এটাকে পাবলিক করান। এটাকে পত্রপত্রিকায় আনার ব্যবস্থা করেন। কারণ ইরিগেশনকে শতভাগ সোলারে করা সম্ভব, ইকোনমিকালি সাশ্রয়ী করা সম্ভব। সেই সুবিধাটা নষ্ট হচ্ছে। ব্যবসা বা মুনাফা লাভ করার জন্য কৃষকের এই সুবিধাটি ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যাবে, এটা প্রতিরোধ করতেই হবে। এটা আমাদের অঙ্গিকার।

এ. বি. এম. শামসুন নবী
সাধারণ সম্পাদক, ক্যাব, মানিকগঞ্জ জেলা কমিটি

২০১১ সাল থেকে ২০২৩ সাল। এই ১২ বছর, মানিকগঞ্জে গ্যাস বিল দেই গ্যাস পাই না, তার স্মারকলিপি দিয়েছি। ক্যাবের কাছে আবেদন, আমরা এর আইনগত সমাধান কিভাবে পেতে পারি?

অধ্যাপক এম শামসুল আলম

আপনারা একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করেন, ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়ার কাছ থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিবেন। এই ফাইলটা নিয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। এবং আমিও থাকব। এটার সাধারণ সমাধান নেই। হাইকোর্টে যেতে হবে। এখানে দেন দরবার করে লাভ হবে না। হাইকোর্টে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নিচ্ছি।

আমাদের লক্ষ্য যৌক্তিক মূল্য হার, রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট। আপনাদের সঙ্গে নিয়ে আমরা জাস্টিস প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাব।

মোঃ সুলাইমান
সাধারণ সম্পাদক, ক্যাব, ভোলা জেলা কমিটি

আমরা লঞ্চে করে চলাফেরা করি। বুড়িগঙ্গার পানির দুর্গন্ধ এবং এই পানি দূষণের কারণে লঞ্চে এটা ব্যবহারের কারণে বিভিন্ন সংক্রামক রোগ হচ্ছে, সেটার জন্য ক্যাব থেকে কি প্রতিকার পেতে পারি?

আবার ভোলা জেলা থেকে গ্যাস উৎপাদন হয়, উত্তোলন হয়, কিন্তু আমরা ভোলায় গ্যাস পাই না।

অধ্যাপক এম শামসুল আলম

আমরা এ বিষয়টি সমাধানের জন্য কাজ করব, তবে সেজন্য আগে আপনাদের এ

বিষয়গুলোকে আরেকটু গুছিয়ে আনতে হবে। আপনারা এগুলো নিয়ে আমাদের কাছে অভিযোগ দেন, আরো মানুষকে এই অভিযোগে যুক্ত করেন।

আমাদের একটি অনলাইন পোর্টাল আছে, ভোক্তাকণ্ঠ ডটকম। আপনারা নিয়মিত সেখানে লেখালেখি করেন এবং আমরা নিয়মিত এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া শুরু করি। আমরা কি করছি সেটা জবাবদিহিতার আওতায় আসুক। আমি ইতিমধ্যে বলেছি জেলায় জেলায় যারা যাচ্ছেন তারা আপনাদের সঙ্গে কথা বলবেন। আপনাদের বাড়িতে যাবেন আলোচনা করে আপনাদের মতামত নিয়ে আসবেন। এবং আমাদের কর্মসূচির চূড়ান্তকরণের ব্যাপারটা ওভারঅল এই প্রক্রিয়ায় হবে।

তবে জ্বালানির বিষয়ে একটি ঘোষণা আসবে। সেটা আগামী ২৯ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে। আপনারা এখানে যেসব ফিডব্যাক দিলেন এই ফিডব্যাক নিয়ে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের একটি ইন্টারনাল মিটিং বসবে। সেই মিটিংয়ে আলোচনা করে আমরা জ্বালানি খাত সংস্কারের মোটামুটি একটা খসড়া তৈরি করব। এবং সেখানে এই ফিডব্যাকগুলো আসবে। যেমন ইরিগেশন, এনার্জি ডেভেলপমেন্ট-এর ব্যাপারটা আসবে। এনার্জি সেক্টরের মধ্যকার সংস্কারের প্রস্তাব আসবে। যেটা আলটিমেটলি প্রতিষ্ঠা করার জন্য রুট লেভেল পর্যন্ত আন্দোলন শুরু করতে হবে।

আন্দোলন শুরু হলেই সংগঠনের একটি কাঠামোগত শক্তি তৈরি হবে। তখন আপনারা যে যেখান থেকে এ ধরনের সমস্যা তুলে ধরছেন তখন এই কাঠামো দিয়েই তা নিষ্পত্তি করা যাবে। এবং এরাই হ্যান্ডেল করবে এবং এটি সার্বজনীন হয়ে যাবে। আপনারা ভোক্তাকণ্ঠে নিয়মিত লিখে যান। আপনার নিজের অঞ্চল থেকে লিখেন। আমরা লক্ষ্য করছি। আমি এবং আমরা নিজেরা এর জবাব দেবো। আমরা কি করছি তা আপনাদের জানাব।

আপনার এখন যে ভাব বিনিময় করছেন, অনুভূতি শেয়ার করছেন সেটা এই প্লাটফর্মে তুলে ধরুন। সবাই এখানে আলাপ করুন। সমবেত হন। আগে ওখানে একতাবদ্ধ হন। তার পরে রাস্তায়। সরকার মানুষের কথা শুনবে। মানুষের কথার বাইরে একসময় সরকার তো যাবে না। সুতরাং সেই জায়গায় যাওয়ার জন্য শক্তি সঞ্চয় করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করার দরকার। আমরা এখানে অঙ্গীকার করতে এসেছি। এই প্লাটফর্মে একতাবদ্ধ হন তারপর আপনার মনের কথা লিখেন এবং দেখেন আপনার কথার প্রেক্ষিতে অন্যরা কী বলছেন। এভাবে এই পর্যায়ে দেখবেন যে আপনাদের জেলাভিত্তিক বিভিন্ন সমস্যা এবং বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে সবাই একতাবদ্ধ হবে, এবং একটা হারমনি তৈরি হবে হবে।

শক্তি কোথায়? আপনাদের মধ্যে। আমাদের মধ্যে নয়।

সমাপনী বক্তব্য ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন
এডভোকেট হুমায়ুন কবির ভূঁইয়া
সাধারণ সম্পাদক, ক্যাব, কেন্দ্রীয় কমিটি

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম। আসসালামু আলাইকুম। ক্যাবের উদ্যোগে আমাদের আজকে

ট্রেনিং কর্মশালা করার কথা ছিল। এটা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করেছেন। আপনাদেরকে আমরা একত্র করেছি এটাই তো আমাদের বড় ট্রেনিং কোর্স। প্রথম ট্রেনিং আমরা আপনাদের সবাইকে একত্র করতে পেরেছি। ট্রেনিং তো বিভিন্নভাবে হয়। আমাদের এই আন্দোলন ১৯৭৮ সালের শুরু হয়েছে। এই আন্দোলনের সাথে আমাদের ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ, ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, অধ্যাপক ড. শামসুল আলম, এনারা কিন্তু পূর্বে ক্যাবে ছিলেন না, আমরা এই সম্মানিত লোকদের যে একত্র করতে পেরেছি আপনাদের এখানে আনতে পেরেছি, এটি একটি ক্যাবের কার্যক্রম।

এই কার্যক্রমটা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আজকে আপনারা অনেকে অনেক সমস্যার কথা বলছেন। নদীর পানি দূষিত হচ্ছে বলছেন, কারো বিদ্যুতের বিল বেশি হচ্ছে, এই সমস্যাগুলোর কথা আমরা প্রত্যেকে জানি। কিন্তু সমাধানের জন্য আমাদের সামষ্টিক শক্তির দরকার। এইসব কিন্তু আমরা আপনাদের নিয়ে করার চেষ্টা করছি। আমরা বলবো না আমরা অনেক বেশি করেছি। আমরা এও বলবো না আমরা করি নাই। আমরা চেষ্টা করেছি।

এই বছর আমরা বিভিন্ন জেলাতে কাজ করছি। আমরা আশা করি সামনের দিকে যদি আপনাদের সহযোগিতা থাকে, আপনারা সহযোগিতা করেন, আমরা এগিয়ে যাব। রমজান মাসেও আপনারা কষ্ট করে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন এরকম মন মানসিকতা, এরকম যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে আমরা ক্যাব যে আন্দোলন করছি, তার সফলতা আসবে।

আজ আপনারা বিভিন্ন জেলা থেকে এখানে অংশগ্রহণ করেছেন। আপনাদের প্রত্যেককে ক্যাবের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আমি এবং আমরা শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানাই।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং এই অনুষ্ঠানের এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করছি। সবাইকে আবারো ধন্যবাদ।

ভোক্তাকণ্ঠ প্রকাশনা

আলোচকবৃন্দ

[আলোচনার ক্রমানুসারে]

০১. **উদ্বোধন: জনাব গোলাম রহমান**
সভাপতি, ক্যাব, কেন্দ্রীয় কমিটি

০২. **প্রবন্ধ উপস্থাপন : প্রকৌশলী এইচ এম জি সরোয়ার**

০৩. **মোস্তাফিজুর রহমান দুলাল**
সভাপতি, ক্যাব, নীলফামারী জেলা কমিটি

০৪. **অধ্যাপক এম শামসুল আলম**
জেষ্ঠ্য সহ-সভাপতি, ক্যাব , কেন্দ্রীয় কমিটি

০৫. **প্রবন্ধ উপস্থাপন: ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ**

০৬. **প্রবন্ধ উপস্থাপন: ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া**

০৭. **আজাদুল ইসলাম আজাদ**
সভাপতি, ক্যাব নওগাঁ জেলা কমিটি

০৮. **ড. মো: আবু তাহের**
সভাপতি, ক্যাব মৌলভীবাজার জেলা কমিটি

০৯. **সিদ্দিকুর রহমান হাওলাদার**
অভিযান বিষয়ক সম্পাদক, ক্যাব, পটুয়াখালী জেলা কমিটি

১০. **মোছা: দিলারা পারভীন**
সদস্য, ক্যাব, মেহেরপুর জেলা কমিটি

১১. **মঞ্জু রাণী প্রামাণিক**
সাধারণ সম্পাদক ক্যাব, টাঙ্গাইল জেলা কমিটি

১২. **তৌহিদুল ইসলাম লিটন**
সাধারণ সম্পাদক, ক্যাব, লালমনিরহাট জেলা কমিটি

১৩. **আলম সারোয়ার টিটু**
সভাপতি, ক্যাব, কিশোরগঞ্জ জেলা কমিটি

১৪. **এম. নাজমুল আজম ডেভিড**
সাধারণ সম্পাদক, ক্যাব, খুলনা জেলা কমিটি

১৫. **আহমেদুল হক খোকন**
সদস্য, ক্যাব, ফেনী জেলা কমিটি

১৬. **মালেকা ইয়াসমিন**
সহ-সভাপতি, ক্যাব, পঞ্চগড় জেলা কমিটি

১৭. **মো: শফিকুল ইসলাম**
সাধারণ সম্পাদক, ক্যাব, দিনাজপুর জেলা কমিটি

১৮. **নবী-নওয়াজ মো: মুজিবুদ্দৌলা সরকার কনক,**
সাধারণ সম্পাদক, ক্যাব, যশোর জেলা কমিটি

১৯. **এ. বি. এম. শামসুন নবী**
সাধারণ সম্পাদক, ক্যাব, মানিকগঞ্জ জেলা কমিটি

২০. **মো: সুলাইমান**
সাধারণ সম্পাদক, ক্যাব, ভোলা জেলা কমিটি

২১. **সমাপনী বক্তব্য ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন: এডভোকেট হুমায়ুন কবির ভূঁইয়া**
সাধারণ সম্পাদক, ক্যাব, কেন্দ্রীয় কমিটি।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা: **প্রকৌশলী শুভ কিবরিয়া,** *কোঅর্ডিনেটর (রিসার্চ), ক্যাব।*